বিলিয়ন ডলার মুসলিম

একজন মুসলিমের সফল উদ্যোক্তা হয়ে উঠার অপরিহার্যতা

খুররাম মালিক

কালের ঘূর্ণাবর্তে সবকিছুর পালাবদল ঘটছে। পরিবর্তন আসছে জীবনের রূপ ও রঙে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন চিন্তা এসে গ্রাস করছে পুরোনো চিন্তার জগৎ। এভাবেই চলছে গ্রহণ-বর্জনের নিরন্তর চক্র।

কালের এই চক্রে সবকিছুতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলেও একমাত্র ইসলাম-ই চৌদ্দশত বছর ধরে চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান বিকাশের অবিকৃত ও পরিপূর্ণ ধারায় রয়েছে বিরাজমান। মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা হিসেবে নাযিল হওয়া ইসলামের বার্তাসমূহের রয়েছে সমসাময়িক ও আগামী জীবনের উপযোগিতা। ইসলামের সুমহান সেই বার্তাগুলো-ই বিশ্বাসী মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ‘সমকালীন প্রকাশন’-এর পথচলা।

বিলিয়ন ডলার মুসলিম

সমকালীন প্রকাশন

প্রকাশকের কথা

ব্যবসা আর চাকরির মাঝে সবচেয়ে বড় পার্থক্যটি হলো—ব্যবসা স্বাধীন আর চাকরি পরাধীন। চাকরি লিমিটেড আর ব্যবসা আনলিমিটেড। চাকরি মানুষকে সীমিত সুবিধায় আবদ্ধ রাখতে চায় আর ব্যবসা আমাদের অমিত সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই ব্যবসা আর চাকরির মধ্যে তুলনা চলে না।

চাকরি দিনশেষে একটা বৃত্তের ভেতর আটকে রাখে। অপরদিকে ব্যবসার কোনো সীমা নেই। ব্যবসার সীমানা সেটাই; যেখানে আপনি থামতে চান। ব্যবসার মাইনাস পয়েন্ট একটাই আর তা হলো ব্যবসায় ঝুঁকি নিতে হয়। মানুষ ঝুঁকি নিতে খুবই ভয় পায়। অধিকাংশ মানুষ বড় বড় উদ্যোগ নিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়—ব্যাপারটা মোটেও এমন নয়। অধিকাংশ মানুষ ব্যর্থ হয়—কারণ জীবনে তারা বড় কোনো উদ্যোগই আসলে নেয় না। নতুন কিছু করা মানেই রিস্ক। কমফোর্টজোনে বন্দি আটপৌরে যাপনে অভ্যস্ত মানুষ ঘোরতর রিস্ক-বিরোধী। তাই আর যা-ই হোক; তাদের জীবন আর উন্নতির মাঝে কখনো দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। আমরা আমাদের চারপাশে যাদের দেখি; আমরাও যদি তা-ই করি। তাহলে আমাদের জীবন আর দশ জনের মতোই সাদামাটা হবে। গৎবাঁধা যাপনের বাইরে এসে নতুন কিছু করার সাহস অর্জন করতে পারলেই কেবল আমাদের জীবনে নতুন কিছু ঘটা সম্ভব। তাই রিস্ক নেওয়া জরুরি।

ব্যবসা আর রিস্ক প্রায় সমার্থক। এই রিস্ক নেওয়ার জন্য যে সাহস ও কৌশল প্রয়োজন, সেসবেরই জোগান দেবে খুরাম মালিক রচিত *বিলিয়ন ডলার মুসলিম*।

ঝুঁকি নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা, ইসলামে ব্যবসার তাৎপর্য, মুসলিম জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং একুশ শতকে ধনী মুসলিমের গুরুত্ব সবিস্তারে তুলে ধরা হয়েছে এখানে। ব্যবসার মূলকথা হচ্ছে—সহজতম পন্থায় মানুষের প্রয়োজন পুরা করা। সেই হিসাবে ব্যবসা তো মুসলিমদের কাছে খিদমতের উপলক্ষ হবার কথা। সাহাবিরা তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই খেদমতের উদ্দেশ্যে বণিকবেশে বেরিয়ে পড়েছিলেন পৃথিবীর দিকে দিকে।

নিখাদ মানবসেবায় মুসলিমদের সাথে পেরে ওঠার কথা নয় কারো। সেই হিসেবে মুসলিমদেরই হওয়ার কথা বিশ্বসেরা বিজনেস-ম্যাগনেট। ইসলাম আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়। এই বই বিশ্বের সফল উদ্যোক্তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সবদিক থেকে বিশ্বসেরা হয়ে ওঠার সেই হৃত গৌরবে আমাদের পুনরুজ্জীবিত করবে, ইনশা আল্লাহ।

এ বইয়ের একটি প্রবন্ধে মুসলিমদেরকে ব্যবসা-সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা দিতে গিয়ে সিনেমার উদাহরণ টেনে আনা হয়েছে। যদিও আমাদের তা করতে বলা হচ্ছে না, কেবল সফলতার গল্প বলে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, তবু তা এক হিসেবে হারাম ও অশ্লীলতা প্রচারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। মুসলিম ভাইদের কাছে হারাম-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রচার কোনোক্রমেই উচিত নয়। বিশেষত এখানে যেহেতু মুসলিমদেরকে ইসলামের আলোকে সফল ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা হওয়ার ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে; তাই অমুসলিমদের বৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যের উদাহরণ তুলে ধরার সুযোগ থাকলেও তাদের হারাম ও শরিয়তবিরোধী কর্মকাণ্ডের সাফল্য বর্ণনা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এ কারণে আমরা সেই প্রবন্ধটিকে বই থেকে বাদ দিয়েছি।

এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বই বাংলাভাষী পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। আলহামদুলিল্লাহ। যাদের শ্রমে সমৃদ্ধ এই বই আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন, আমিন।

প্রকাশক

সমকালীন প্রকাশন

সূচিপত্র

কেন এ বই?

[এক সফল ব্যবসায়ীর গল্প]

> কারো বুদ্ধিমত্তা পরিপক্ব হয়েছে কি না বুঝবেন কীভাবে? তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখে। সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে যাবার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যার মাঝে সফল হবার ইচ্ছে নেই, তারচেয়ে বোকা মানুষ এই পৃথিবীতে আর একটিও নেই!—ইবনুল জাওযি[১]

আমার নাম খুরাম মালিক। ক্লায়েন্ট আর সহকর্মীদের কাছে আমি 'দা স্ট্র্যাটেজিস্ট' নামে পরিচিত। বর্তমানে একটি কোম্পানিকে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি-পরামর্শ আর দিকনির্দেশনা প্রদানের কাজে নিয়োজিত রয়েছি।

১৬ বছর বয়স থেকেই আমি ব্যবসার মধ্যে আছি। ব্যবসায় ইসলামিক মনোভাব কীভাবে আমায় সাহায্য করল, সেই অভিজ্ঞতা শেয়ারের জন্যই কলম ধরা। বইটি কোনো ফিকহ-চর্চার বই নয়। ব্যবসার ক্ষেত্রে ইসলাম কী বলে আর বলে না, সেসব কথা খুঁজে পাবেন না এখানে। বইটি আসলে এক আধ্যাত্মিক গাইড। বহু মানুষের কাজে এসেছে এ বই। আপনার জন্যও হতে পারে সমানভাবে কার্যকর।

আমি বদলে দিতে চাই ব্যবসাপাতি নিয়ে মুসলিমদের চিন্তাভাবনা। আমি চাই মুসলিম প্রতিষ্ঠানগুলো নেতৃত্বের স্থানে যাবে।

---

[১] *সাইদুল খাতির*, পৃষ্ঠা : ২৮; *সাইদুল আফকার*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৩২৬

আমার সবচেয়ে বড় দুনিয়াবি স্বপ্ন কী জানেন? আমার স্বপ্ন মুসলিম ব্র্যান্ডগুলো মানুষের পছন্দের তালিকার শীর্ষে থাকবে, মানুষ এগুলোকে সমীহ করবে। আমি চাই এগুলোর স্থান হবে মানুষের ঘরে ঘরে। আমার ইচ্ছা মুসলিম উদ্যোক্তারা হবেন বাজারের লিডার। তারা নতুন নতুন উদ্ভাবনে থাকবেন সবার চেয়ে এগিয়ে। তাদের সফলতা আর সম্পদ তারা ব্যবহার করবেন সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে।

এক ভাই আমাকে বলেছিলেন, 'আপনি তো ভাই অনেক দিন ধরে এই লাইনে আছেন। আপনার জীবনে অনেক উত্থান-পতন হয়েছে। কিন্তু এসব তো সবার জীবনেই ঘটে। তবে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো অন্য সবার মতো নয়। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আপনাকে জ্ঞান দিয়েছেন। ব্যবসাটা আপনি সত্যিই ভালো বোঝেন। নবিজির সুন্নাহ অনুসারে কীভাবে ব্যবসা করতে হবে, তাও আপনি জানেন। পাশাপাশি দুনিয়ার হাল-হাকিকত সম্পর্কেও রয়েছে আপনার অগাধ পাণ্ডিত্য। আমার বিশ্বাস, একমাত্র আপনিই আমাকে ব্যবসার নিগূঢ় কৌশলটা ধরিয়ে দিতে পারবেন। কীভাবে সেই কৌশল ব্যবসায় প্রয়োগ করব, সেটাও আপনি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারবেন। আল্লাহ আপনাকে যে বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন, তা সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। তার কথা শুনেই আমি এ বইটি লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

☆☆☆

তখন আমার বয়স মাত্র ১৪। চাকরিবাকরি করে আব্বু যে সামান্য কিছু জমিয়েছেন, ভাবছেন সেটা কোথাও খাটাবেন। কিন্তু কীভাবে কী শুরু করবেন নিশ্চিত নন তিনি। আব্বু আমাকে শেয়ার মার্কেটের[১] লিফলেট ধরিয়ে দিয়ে দেখতে বললেন—

[১] এটা লেখকের কিশোর বয়সের একটি পারিবারিক ঘটনা, যা শেয়ার মার্কেটের বৈধতার ক্ষেত্রে অন্যদের জন্য দলিল বা উৎসাহের কারণ হতে পারে না। সম্ভবত লেখক এ ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করেছেন তার ব্যাবসায়িক জীবনের সূচনাটা কীভাবে হয়েছিল তা বর্ণনা করার জন্য, এটা হালাল ও ইসলাম-অনুমোদিত ব্যবসা সেটা বোঝানোর জন্য নয়। এমনিতেও ছোট কিংবা বড় কোনো আলিমও যদি প্রচলিত শেয়ার মার্কেটের ব্যবসা করেন, তবু তা অন্যদের জন্য দলিল বা অনুসরণযোগ্য হতে পারে না, সেখানে একজন ১৪ বছরের কিশোরের পারিবারিক ঘটনার কথা তো বলাই বাহুল্য।

আধুনিক পুঁজিবাদব্যবস্থায় শেয়ার মার্কেটের লেনদেনকে সমকালীন বিজ্ঞ ফকিহগণ হারাম বলে অভিহিত করেছেন। কারণ এতে সুদি কারবার, হারাম পণ্যের লেনদেন, শিরকত বা যৌথ বিনিয়োগের শর্ত লঙ্ঘন, ধোঁকা, জুয়া ইত্যাদি পাওয়া যায়, যার একটির অস্তিত্বই যেকোনো লেনদেন হারাম হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আলিমগণ কঠিন কিছু শর্তের ভিত্তিতে সীমিত পরিসরে এটার অনুমোদন দিলেও বাস্তবতা হলো, এসব শর্তপালন বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে অসম্ভব আর সেটা পশ্চিমা পুঁজিবাদব্যবস্থার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ

কীভাবে অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়, কাজ শুরু করতে হয়। ছুটির মধ্যে পুরো ব্রোশার পড়ে শেষ করে যা যা শিখেছি সব জানালাম মাকে। মা জানালেন বাবাকে।

তারপর এলো সেই দিন। আমরা শেয়ার কিনব। আব্বু দরকারি কাগজপত্রের কাজ সারলেন। আবেদনপত্র পূরণ করলেন। শুরু হলো আমাদের শেয়ার কেনা।

২ বছর পর আমাদের ২ হাজার পাউন্ডের বিনিয়োগ গিয়ে দাঁড়ালো ২০ হাজারে। এর মাঝে অবশ্য কমবেশি হয়েছে কয়েকবার।

মিথ্যে বলব না, প্রায় পুরোটা সময় শেয়ার কেনাবেচা ছিল অনুমান-নির্ভর। আমার ভাগ্য ভালো ছিল। অবশ্য আর্থিক পরমার্শদাতাদের সঙ্গো ইমেইল চালাচালি হয়েছিল আমার। তাদের সাথে শেয়ার করছিলাম আমার বিনিয়োগ ধারণা। তারা আমাকে বিভিন্ন উপকারী টিপস দিচ্ছিলেন। তারা অবশ্য বুঝতে পারেননি ওপারে বসে এসব ইমেইল টাইপ করছে মাত্র ১৪ বছরের এক কিশোর।

ছোটবেলা থেকে কম্পিউটার আর প্রযুক্তির বিষয়ে আমার মারাত্মক ঝোঁক। আমার বয়স তখন ১৬। আমার বন্ধুরা বড় রাস্তার ধারে ম্যাকডোনাল্ডসের মতো দোকানগুলোয় কাজ নিচ্ছিল। আর আমার আব্বু আমাকে চাকরি নিয়ে দিলেন এক কম্পিউটারের দোকানে। দোকানের মালিক আমাকে অল্পকিছু সম্মানীর বিনিময়ে পিসি বানানো আর উইন্ডোজ ইনস্টল দেওয়া শেখাবেন।

১ বছরে ৫ শয়েরও ওপরে পিসি বানিয়ে দিলাম আমরা। এই অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে আমি আর আমার বন্ধু অ্যান্ড্রু ঠিক করলাম বাসা থেকে আমরা নিজেরাই তাহলে পিসি বানিয়ে বেচি।

দুজনে মিলে প্রথমে গ্যারেজ সাফ করলাম আমরা। দেওয়ালের রং করলাম সাদা। আর ডিসপ্লে হিসেবে রাখলাম আমার নিজের ডেস্কটপ। আব্বু অবশ্য আমার এই কাজে খুশি ছিলেন না। আমার পড়াশোনার সুবিধার জন্য তার দুই মাসেরও বেশি সময়ের বেতন দিয়ে ডেস্কটপটা কিনে দিয়েছিলেন ওই সময়ে।

মতের প্রবক্তারাও এ তিক্ত বাস্তবতা স্বীকার করেন। তাছাড়াও এসব শর্তের বিষয়টি ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকেও যথেষ্ট প্রশ্নবিদ্ধ। এজন্য তারাও এসব কারবার থেকে মানুষকে যথাসম্ভব দূরে থাকার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। মোটকথা, শেয়ার মার্কেটের ব্যবসা শারয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণরূপে হারাম বা কমপক্ষে মারাত্মক সংশয়পূর্ণ একটি লেনদেন। তাই এ ধরনের লেনদেন থেকে অবশ্যই আমাদের বিরত থাকতে হবে।—শারয়ি সম্পাদক

দোকান রেডি। আমি আর অ্যান্ড্রু মিলে কয়েক দিন আশপাশের এলাকায় লিফলেট বিলালাম। সপ্তাখানেক বাদে এক যুবক আমাদের দোকানে এলেন। ২ শ পাউন্ড ধরিয়ে বললেন তার জন্য একটি পিসি বানিয়ে রবিবার রাতের মধ্যে যেন ডেলিভারি দিয়ে দিই।

আমাদের প্রথম পিসি বেঁচে লাভ হয়েছিল ২৮৬ পাউন্ড। আমার মতো হালকা-পাতলা লাজুক ছেলের জন্য এ যেন লাখ টাকা। রাতে নিজের ঘরে যাবার সময় শুনি আব্বু আম্মুকে বলছেন, 'আমার মনে হয় ওদেরকে একটু হেল্প করা দরকার। ওদের কাজকারবার দেখাশোনার জন্য একজন বড় মানুষ থাকলে ভালো হবে।'

আব্বু অফিসে গিয়ে কলিগদের বলতেন, আমার ছেলে কিন্তু কম্পিউটার বানায়। প্রতি ডেস্কে একটি করে কম্পিউটার থাকার বিল গেইটসের যে স্বপ্ন তা তখনো বাস্তব হয়নি। ওই সময়ে প্রায় সবাই একটা কম্পিউটারের মালিক হতে এক পায়ে খাড়া। ইন্টারনেট তখনো অত পরিচিত শব্দ না। বাবা-মায়েরা তখন সন্তানদের কম্পিউটার কিনে দেওয়ার কথা ভাবতেন কেবল ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার সুবিধার জন্য।

প্রতিদিন কিছু না কিছু পিসি ডেলিভারি করতে লাগলাম আব্বুর কলিগদের, তার বন্ধুদের। একটা সময়ে দেখা গেল গ্যারেজে জায়গা কুলোচ্ছে না। কিন্তু চাহিদা তো বাড়ছে দিন দিন। ওদিকে তখন পার্টিগুলোতে সবার মুখে কম্পিউটার-কম্পিউটার রব। আব্বু এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে তার এক কলিগের ভাইয়ের সঙ্গে কম্পিউটারের দোকান দিতে চাইলেন। প্রথমে আমাদের প্ল্যান ছিল ওই লোক দোকানে বসবেন প্রতিদিন। আর আব্বু প্রাথমিক পুঁজিটা দেবেন। আব্বু চাচ্ছিলেন না, ডিগ্রি অর্জনের আগে আমি এই কাজে খুব বেশি জড়াই।

কিন্তু বিধি বাম। ওই লোক প্রথম দিন থেকেই লাপাত্তা। শেষে আমাকেই যেতে হলো।

সকালে ভার্সিটি যেতাম। আর দুপুরে থাকতাম দোকানে। কাস্টমারদের সাথে গপসপ, পিসি বানানো, নতুন স্টক অর্ডার, টালি খাতায় হিসেব তোলা, ব্যাংকে টাকা জমা—সপ্তায় ৬ দিন এই ছিল আমার কাজ। ১৮ বছরের এক তরুণের জন্য কম না কিন্তু।

আমার চাচার এক বন্ধুর কম্পিউটার ব্যবসা তখন থমকে যায়। যখন ভালো চলত ৩০ হাজার পাউন্ড লাভ হতো। ওই লোকই আমার প্রথম কম্পিউটার বানিয়ে দেয়। আমি বসে বসে দেখতাম সেটা। পরে যখন দোকান দিলেন, আমি মাঝে মাঝে যেতাম। অনেক কিছুই শিখেছি তার কাছে। ওসব অভিজ্ঞতা আর আমার কৌতূহল ধীরে ধীরে আমার পালে হাওয়া দিয়েছে। কম্পিউটার আমার ভালো লাগত খুব। নতুন নতুন চিন্তা-ধারণা বাজিয়ে দেখতে ভালো লাগত। এগুলোই আমাকে এগিয়ে নিয়েছে। আরেকটা গুণ ছিল আমার। কোনো কিছু জানার জন্য প্রশ্ন করতে একদমই ভয় পেতাম না আমি।

আমাদের দোকান তখন সবে ব্রেক-ইভেনে এসেছে। আব্বুর কিছু বন্ধুবান্ধব ঠিক করলেন তারাও এই ব্যবসা করবেন। আমাকে মাঝে মাঝেই আব্বু পাঠাতেন তাদের বিভিন্ন বিষয় জানাতে। আমার মতো এক তরুণ কিনা বয়স্ক মানুষদের শেখাচ্ছে!

আমাদের দ্বিতীয় দোকান শুরু করলাম যখন ক্যামব্রিজ থেকে ইন্টার্ন করে আসি। তত দিনে শেখা হয়েছে অনেক—ভালো কর্মী কীভাবে নিতে হয়, কাস্টমারদের কীভাবে বোঝাতে হয়, কেন বড় কোনো ব্র্যান্ডের দোকান থেকে না নিয়ে আমাদের থেকে নেবেন, সাপ্লায়ারদের সাথে কীভাবে আরো ভালো করে বনিবনা করতে হয়, কীভাবে আরো বেশি কাস্টমার পাওয়া যায়।

ওই বছর আমাদের কম্পিউটার দোকান থেকে লাভ হয় প্রায় ১ মিলিয়ন পাউন্ড। বয়স তখন আমার মাত্র ২০ বছর!

☆☆☆

কেন যে উদ্যোক্তা হয়েছি তা আমি নিজেও জানতাম না অনেকদিন। কীভাবে হয়েছি বলতে পারতাম। কিন্তু কেন হয়েছি বলতে পারতাম না। যদি কোনো একটা কারণ বলতে হয়, তা হলে সেই কারণ সম্ভবত এটাই—এক লোককে আমি দেখতাম প্রতিদিন কাজে যাবার জন্য মুখিয়ে থাকেন। কাজ করতে তার ভীষণ ভালো লাগে। আমার আব্বু-আম্মু মিলে যা উপার্জন করেন, তিনি তাদের অর্ধেক বয়সে তারচেয়ে বেশি ইনকাম করেন। তিনি মেহনত করতেন প্রচুর।

আর এদিকে দেখতাম আমার আব্বুর কপালে বন্ধকি শোধের ভাঁজ। অফিসে বসের দুর্ব্যবহারের কষ্ট। অফিসে কারো কারো বেলায় এক ধরনের বৈষম্য হয়। আব্বু

ছিলেন তার শিকার।

আম্মু শিক্ষক হিসেবে ছিলেন বেশ আন্তরিক, উৎসাহী, মেহনতি। কিন্তু তারপরও কত সময় দেখেছি কাজ করতে করতে কষ্টে তার কান্না আসছে। খরচ মেটানোর জন্য এই ধরনের মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত হবার কোনো কারণ খুঁজে পাইনি আমি।

আরেকটা কারণ—আমি কম্পিউটার ভালোবাসি।

ভার্সিটি শেষ করলাম যখন, যুক্তরাজ্যের এক শীর্ষস্থানীয় টেলিকম কোম্পানি ইউরোপের সঙ্গে বৈশ্বিকভাবে একীভূত হচ্ছিল। একীভূত হবার পর মধ্যপ্রাচ্যেও ওরা ভালো কিছু চুক্তি করতে পেরেছিল। তখনই প্রথম বুঝলাম বড় বড় ব্যবসাগুলো বিশ্বে কী ধরনের প্রভাব রাখে। অবকাঠামোর গুরুত্বও বুঝলাম। ধারণা পেলাম কীভাবে এসব ব্যবসা অর্থনীতি, সমাজ আর রাজনীতির নিয়ামক হয়ে ওঠে।

আরো অনেক কিছু শেখার বাকি তখন। সম্ভাবনাগুলো ধরতে শুরু করলাম। হৃদয়ের মানসপটে এঁকে নিলাম আমার জীবনের মাকসাদ—এমন একটি অবকাঠামো তৈরি করব যার দ্বারা সমাজের মানুষগুলো উপকৃত হবে। তবে তখনো জানতাম না, কোথা থেকে কী শুরু করব। শুধু জানতাম যদি উদ্যোক্তা হবার মাঝে লেগে থাকি, নিজের পথ নিজেই করে নিতে পারব।

আজও এটা আমার মূল প্রেরণা—সমাজের কল্যাণে বাণিজ্যিক সংগঠন তৈরির কাজটিকে সবাই লঞ্চিং প্যাড হিসেবে জানে। কথাটা বলতে বলতে পচে গেছে। তবু বলব, বিষয়টা শুধু টাকা কামানোর বিষয় না। মিলিয়নিয়াররা নিজেদের আর্থিক স্বাধীনতা তৈরি করে। তারা ভালো গাড়ির মালিক হয়, বাড়ির মালিক হয়। অর্থাৎ মিলিয়নিয়াররা নিজের দুনিয়া বদলায়। আর বিলিয়নিয়াররা বদলে দেয় সারা পৃথিবী।

দিনবদলের স্বপ্ন

[মুক্ত জীবনের পথে]

> অফিশিয়াল পোশাক কিনে সেই পোশাকে কাজে যাওয়াটাই এখন স্বাভাবিক। গাড়ি চালিয়ে কাজে যাওয়াটাও স্বাভাবিক। অথচ সেই গাড়ির কিস্তি এখনো শোধ করে যেতে হচ্ছে আপনাকে। এই কাজগুলো করছেন চাকরির জন্য। না হলে যে আপনার কাপড়চোপড়, গাড়ি আর বাড়ির খরচ দিতে পারবেন না। এমন বাড়িতে থাকার জন্য এত মেহনত, যে বাড়ি কিনা প্রায় সারাদিন খালিই থাকে।
> —ইলেন গুডম্যান, অ্যামেরিকান সাংবাদিক

নতুন যাদের সাথে দেখা হয়, আমি প্রায় সময়ে জিজ্ঞেস করি, 'আপনার হাতে যদি যথেষ্ট টাকা থাকত, যদি জানতেন, টাকার জন্য জীবনে আর কখনো কাজ করতে হবে না, তখন কী করতেন?'

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রথম উত্তর হয়, 'চাকরি ছেড়ে দিতাম।' জীবনে অল্প কিছু লোকই খুশি থাকে তাদের চাকরিবাকরি নিয়ে।

এরপর লোকজন বলে একটা বাড়ি আর গাড়ি কিনবে। বাবা-মায়ের জন্য কিছু করবে। আর তারপর ইসলামের জন্য কিছু করবে। অথবা কল্যাণকর কিছু।

আমাদের বেতন যত বেশিই হোক, আমাদের স্বপ্ন পূরণের জন্য পরিমিত সম্পদ অল্প কজনই অর্জন করে।

☆☆☆

একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকা অবস্থায় জুলেখা বেগম সিদ্ধান্ত নিলেন, শিক্ষকতা করবেন।[১] এজন্য পড়াশোনা করেছেন একটানা ৩ বছরেরও বেশি সময়। প্রয়োজনীয়

---

[১] মেয়েদের চাকরি করার ব্যাপারে ইসলামের রয়েছে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান। ইসলাম যেহেতু বিয়ের আগে বা পরে মেয়েদের ওপর আর্থিক কোনো দায়িত্ব অর্পণ করেনি, তাই মৌলিকভাবে তাদের অর্থ উপার্জনকে উৎসাহিতও করেনি। বিয়ের আগপর্যন্ত সে বাবা, ভাই কিংবা চাচার নিয়ন্ত্রণে, বিয়ের পর স্বামীর নিয়ন্ত্রণে আর শেষ জীবনে স্বামী মারা গেলে বা উপার্জনে অক্ষম হয়ে পড়লে নিজের সন্তানের নিয়ন্ত্রণে। এদের কেউ না থাকলে নিজের অন্য কোনো সামর্থ্যবান মাহরাম আত্মীয়ের নিয়ন্ত্রণে। দায়িত্ব নেওয়ার মতো কোনো আত্মীয় না থাকলে সেক্ষেত্রে তার দায়িত্ব ইসলামি খলিফার। তিনি তার সকল ব্যয়ভার বাইতুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) থেকে বহন করবেন। মোটকথা সর্বাবস্থায়ই ইসলাম নারীদের আর্থিক দায়িত্ব অন্যের ওপর দিয়েছে, তার নিজের ওপর নয়। তাই বৈধ পন্থায় হলেও নারীদের অর্থ উপার্জনকে ইসলাম উৎসাহিত করেনি।

বৈধ পন্থায় হলে স্বাভাবিক অবস্থায় নারীদের অর্থ উপার্জনে যদিও শরিয়তের নিষেধ নেই, তারপরও নানারকম ফিতনার আশঙ্কায় এ থেকে তাদের দূরে থাকাই ভালো ও নিরাপদ। বৈধ পন্থা বলতে, তার কর্ম বা ব্যবসা হালাল হওয়া, এতে কোনোরূপ পর্দার লঙ্ঘন না হওয়া, সালাত-সিয়ামসহ কোনো ইবাদত পালনে ব্যাঘাত না ঘটা, গাইরে মাহরাম পুরুষদের সাথে ফ্রি-মিক্সিং না থাকা, স্বামী-সন্তান বা পরিবারের অন্য কারো অধিকার খর্ব না হওয়া ইত্যাদি। যদি কোনো কাজ বা ব্যবসা করতে গিয়ে এসবের কোনোটি পাওয়া যায় তাহলে তার জন্য সেটার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা হালাল হবে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, বর্তমান সময়ে আমাদের মুসলিম নারীরা স্বামী-সংসার ফেলে যেভাবে চাকরি করছে, এর বেশিরভাগই হারাম। এটা মূলত ইসলামি কালচার নয়, এটা আমদানি হয়েছে পশ্চিমা পুঁজিবাদী ধারণা ও তাদের সমাজ থেকে। 'বেশি করে অর্থ উপার্জন করো, আর জীবনটাকে আরো মজা করে উপভোগ করো' এমন ভোগবাদি শ্লোগানই নারীদের চাকরিতে আসার প্রধানতম কারণ। গাড়ি, বাড়ি, ফ্ল্যাট, উন্নত ফার্নিচার, সামাজিক পাওয়ার, উজ্জ্বল ক্যারিয়ার এসবই হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের অধিকাংশ নারীর স্বপ্ন। এটাকেই তারা প্রয়োজন ও অত্যাবশ্যক বলে অভিহিত করছে। অথচ ইসলাম কখনো এটাকে আবশ্যকতার গন্ডিতে অন্তর্ভুক্ত করেনি। এসব হচ্ছে ভোগবাদ, পুঁজিবাদ। এটা তারা শিখেছে পশ্চিমা শিক্ষা ও তাদের অর্থব্যবস্থা থেকে, ইসলাম থেকে নয়।

তবে হ্যাঁ, নারীদের কখনো যে অর্থের প্রয়োজন হয় না, তাও কিন্তু নয়। এটা ঠিক যে, তাদের জীবনেও কখনো এমন পরিস্থিতি আসতে পারে। ইসলাম এ বিষয়টিরও খেয়াল রেখেছে। আসলেই যদি জীবনের তাগিদে কোনো নারীর কখনো অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ে; অথচ তার বাবা, স্বামী, সন্তান, আত্মীয়স্বজন কিংবা এমন কোনো পাড়া-প্রতিবেশী বা দয়াবান লোক না থাকে, যে তার দায়িত্ব বহন করবে, তাহলে ইসলাম তাকে অর্থ উপার্জনের অনুমতি দেয়, ভিক্ষা না করে তাকে হালাল কাজকর্ম কিংবা ব্যবসা করতে উৎসাহিত করে। ইসলামি খিলাফত থাকলে তো তার উপার্জনেরই দরকার পড়ত না। কারণ খলিফা বাইতুল মাল থেকে তার যাবতীয় ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। কিন্তু বর্তমানে যেহেতু খিলাফত-ব্যবস্থা নেই, তাই স্বামী-সন্তান বা সামর্থ্যবান আত্মীয়-প্রতিবেশীর অবর্তমানে তাকেই উপার্জন করতে হবে। ইসলাম এটাকে নিষেধ করে না; বরং পরিষ্কারভাবেই তাকে উপার্জনের অনুমতি দেয়। তবে এক্ষেত্রে নিজের সাধ্যের মধ্যে ইসলামের সকল সীমারেখা মেনে চলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। পর্দা লঙ্ঘনের বিষয় থেকে শুরু করে নারী-পুরুষ একসাথে কাজ করাসহ ইসলাম-পরিপন্থী প্রতিটি বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে ঘরে বসেই কিছু বানিয়ে বিক্রি করার চেষ্টা করবে, বাচ্চাদের টিউশনি করবে, সেলাই মেশিনের

ডিগ্রি নিয়ে জয়েন করলেন একটি স্কুলে। অক্লান্ত পরিশ্রম আর মেহনতের কারণে দু-তিন বছরের মধ্যেই পেয়ে গেলেন প্রমোশন। এখন তার কাজ শুরু হয় সকাল সাড়ে সাতটায়। দুপুরের খাবারের সময় পর্যন্ত বাচ্চাদের পড়ান। খাবারের সময় দেখেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজকর্ম। এরপর স্কুল শেষ না হওয়া পর্যন্ত আবার পড়ানো। সব কাজবাজ শেষ করে অফিস থেকে বের হন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়। বাসায় ফিরতে ফিরতে ৭টা। এসে রান্নাবান্না করেন। স্বামী আর সন্তানদের খাবারের ইন্তেজাম করেন। এরপর রাতে স্কুলের আরো কিছু জরুরি কাজ করে বিছানায় শুতে যান ১১টায়। পরদিন আবার সেই একই চক্র।

কখনো কখনো ছুটির দিনেও আধাবেলা চলে যায় স্কুলের কাজে। কখনো তো পুরো দিনই।

তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, বিছানায় শুলে প্রায় সময়ে তার ঘুম আসে না, পরের দিনের কাজের চিন্তায়। সকালে উঠেও ওই চিন্তাগুলো মাথা খেয়ে ফেলে। তার মন এত ছোটাছুটি করে যে, তার মনে হয় রাতে যেন তিনি ঘুমানইনি।

কাজ করবে ইত্যাদি। তাই জীবিকার অজুহাতে বর্তমানে নারীদের ঘরের বাইরে গিয়ে পুরুষদের সাথে মিলেমিশে চাকরি করতে চাওয়া মূলত এক ধরনের বিলাসিতা। একান্ত প্রয়োজন ও বাধ্য না হলে শরিয়ত কখনো এটার অনুমতি দেয় না। হাতের কাজ, সেলাইয়ের কাজ, বাচ্চাদের পড়ানোসহ এমন অনেক ঘরোয়া কাজ আছে, যা ঘরে বসেই আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব। বর্তমানে তো ঘরে বসে হালাল পন্থায় ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমেও অনেক উপার্জন করা যায়।

মোটকথা, পুরুষদের সাথে অফিসে গিয়ে কাজ করার মতো বাধ্যবাধকতা নারীদের হয় না বললেই চলে। তাই ঘর থেকে একাকী নারীদের বের হয়ে পুরুষদের সাথে মিলেমিশে চাকরি করার বিষয়টি কখনো ইসলামে অনুমোদনযোগ্য হতে পারে না। শারয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের জীবনে এরকম প্রয়োজন ও বাধ্যবাধকতা হয়তো ১ পার্সেন্টও হবে না। তবে আসলেই যদি কোনো নারীর এমন প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যেখানে এভাবে চাকরি ছাড়া তার আর কোনোই উপায় নেই এবং এভাবে চাকরি না করলে তার জীবনযাত্রা অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলে বিজ্ঞ কোনো আলিমের কাছে সব অবস্থা খুলে বললে তিনি হয়তো সার্বিক পরিস্থিতি যাচাই তাকে সাময়িক সময়ের জন্য অনুমতি দিতে পারেন, কিন্তু এটা সাধারণ অবস্থার মাসআলা নয় এবং কোনো স্থায়ী সমাধানও নয়। সাধারণত নারীদের জীবনে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় না বললেই চলে, তাই সর্বজনীনভাবে ফাতওয়া এটাই থাকবে যে, শরিয়তের বিধান লঙ্ঘন করে গাইরে মাহরাম পুরুষদের সাথে মিলেমিশে নারীদের চাকরি করা বৈধ নয়। জীবনের তাগিদে অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন পড়লে ঘরোয়াভাবেই উপার্জনের চেষ্টা করতে হবে; যেমনটি বর্তমানে অনেক দ্বীনদার নারীই করে থাকেন। আর একান্ত বাইরে বের হওয়ার প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে পর্দা ও নিরাপত্তার সাথে বের হয়ে ইসলামের সকল বিধান মেনেই সকল কাজ সমাধা করবে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। তাই এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো, যেন এ-সম্পর্কিত সকল সংশয় ও সন্দেহ দূর হয়ে যায়।—শারয়ি সম্পাদক

জুলেখা আর তার স্বামী দুজনের চাকরিতেই প্রচুর খাটাখাটুনি। কিন্তু এত কাজ আর পরিশ্রম করার পরও বছরজুড়ে বিভিন্ন সময়ে মনে হয়, সংসারের খরচ মিটবে তো?

কারো কারো কাছে এ ধরনের ঘটনাগুলো ভয়াবহ অবস্থা মনে হতে পারে; অথচ এগুলো কিন্তু ব্যতিক্রম নয়। পৃথিবীতে এমন জীবন পার করা লোকজন কম নয় একেবারে। আমাদের ভাইবোনেরা চাকরিতে কতই না ঘাম ঝরাচ্ছেন। বিনিময়ে পাচ্ছেন সামান্য কিছু টাকা। যখন আমরা কাজে এমন ব্যস্ত, সংসার নিয়ে মশগুল, তখন সমাজের স্বার্থে ভালো কিছু করার মতো শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য কোথায় আমাদের?

শুধু ব্যাংক-ব্যালেন্সই সম্পদের পরিমাণ বোঝায় না। সম্পদ তো—জীবনে যা চাই তা করার স্বাধীনতা। বহুকাল পরে বিংশ শতাব্দীর লোকজন তা ঠিকই বুঝতে পেরেছে।

ঋণের বোঝায় জর্জরিত

[শিখুন অর্থের সদ্ব্যবহার]

> ৪০ বছর ধরে সপ্তাহে ৫ দিন কাজ করে ব্যাংকের ঋণ শোধ করাকে স্বাধীনতা ভাবে যারা, আমি সেই প্রজাতির লোক।—নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি।

৯০-এর দশকের শুরুতে ইরাক থেকে বাবার সাথে আসে মেধাবী এক ছাত্র। নাম তার ইউসুফ। তখন তার বয়স মাত্র ৭। তার বাবা এখানে এসেছিলেন পিএইচডি করতে। এখানে যেহেতু থাকতে হবে ৭ বছরের মতো, সেজন্য পরিবারকেও নিয়ে এসেছিলেন তিনি।

ছাত্র হিসেবে ভালোই ছিল ইউসুফ। কিন্তু অনেক শিক্ষক তাকে বলত জীবনে সে বেশি দূর যেতে পারবে না। কথাটা তাকে মানসিকভাবে প্রচণ্ড আঘাত করে।

ইউসুফের বাবার যখন পিএইচডি শেষ তখন তার বয়স ১৪। তার বাবার স্টুডেন্ট ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। তাই ইরাকে ফিরে যেতে হলো তাদের।

২৫ বছর পর ইউসুফ ভাষাতত্ত্বে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য আবেদন করে যুক্তরাজ্যে।[১]

---

[১] অমুসলিমদের দেশে ভ্রমণ করার ক্ষেত্রে বিধান হলো, স্রেফ বিনোদন বা ঘোরাফেরার উদ্দেশ্যে অমুসলিমদের দেশে যাওয়াও নাজায়িয। কারণ এতে নিজের দ্বীন ও আখলাক নষ্ট হবার ভয় থাকে। তবে দ্বীনি বা পার্থিব বৈধ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে যাওয়া যাবে। যেমন : চিকিৎসা, ব্যবসা-বাণিজ্য, পড়াশোনা, চাকুরি,

ততদিনে সে বিয়ে করেছে। ফুটফুটে দুটি সন্তানও আছে তার। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকে থেকেও নিজের চেষ্টায় আজ যুক্তরাজ্যে নিজের অবস্থান তৈরি করার সুযোগ পেয়েছে ইউসুফ। ওখানে ছেলেবেলায় তার কত স্মৃতি। কত বন্ধুবান্ধব ছিল তখন। কতই না সুন্দর হবে জীবন, যদি আবার সেখানে যেতে পারে সে! যেভাবেই হোক, যুক্তরাজ্যে তাকে যেতেই হবে। এই অস্থিতিশীল ইরাক ছাড়তে মরিয়া সে। এখন পিএইচডিই তার একমাত্র ভরসা।

যুক্তরাজ্যে ইউসুফের পিএইচডি শেষ হলো ৪ বছর পর। ততদিনে ঋণের খাতায় জমেছে ৬০ হাজার পাউন্ড। তার স্টুডেন্ট ভিসার মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। ওদিকে ইরাকে যে ফিরে যাবে—ওখানকার অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে এতদিনে। বিদ্রোহীরা আসায় তার বাবা-মা বাধ্য হয়েছেন নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে। এখানেই যেন তিনি থাকতে পারেন এজন্য আকুল আবেদন করলেন বৃত্তিদাতার কাছে। কিন্তু তার কাছে বিকল্প আছে মাত্র দুটি রাস্তা। বৃত্তিদাতা প্রতিষ্ঠানের পছন্দমতো চাকরি করতে হবে ইরাকে গিয়ে। নতুবা শোধ করতে হবে ৬০ হাজার পাউন্ড ঋণ। ঘরে ২টি বাচ্চা, আরেকটি আসছে। ইরাকে যাওয়া ছাড়া আর কোনো বাড়তি আয়ের রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না সে।

ইউসুফ ইরাকে ফিরে গেছে। ততদিনে বের হয়েছে তার রিসার্চ পেপার। কুড়িয়েছে বহু অ্যাকাডেমিক প্রশংসা। ভাষাতত্ত্বে পেয়েছে পরিচিতি।

পেপার প্রকাশের কয়েক মাস পর ইউসুফ ফোন করল যুক্তরাজ্যে তার এক বন্ধুকে। ভবন-নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের সিইওদের পরামর্শ দেন তিনি। ইউসুফ তার কাছে জানতে চান কীভাবে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান চালাতে হয়। তার প্রশ্ন শুনে বেশ অবাক হয়েছিলেন তার বন্ধু। তিনি জানেন ইউসুফ একজন ভাষাতত্ত্ববিদ। হঠাৎ তবে কেন ক্যারিয়ার বদলের চিন্তা? তা-ও আবার এতদিনের এত মেহনতের পর।

ইউসুফ জবাবে বলল, 'গত পনেরোটা বছর ধরে পড়তে পড়তে জান শেষ করে ফেললাম। কিন্তু কী লাভ হয়েছে? আমার এখন তিনটা বাচ্চা। এখনো আমাকে

দ্বীনের দাওয়াত ইত্যাদি। তবে এক্ষেত্রে তিনটি শর্ত রয়েছে। এক. ইসলামি শরিয়তের বিষয়ে তার এতটুকু জ্ঞান থাকতে হবে, যার দ্বারা সে দ্বীনের ব্যাপারে সংশয়ে পড়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। দুই. তার এতটুকু চারিত্রিক দৃঢ়তা থাকতে হবে, যার ওপর ভিত্তি করে সে সকল ধরনের অশ্লীলতা ও নোংরামি থেকে বিরত থাকতে পারে। তিন. সে দেশে পূর্ণভাবে দ্বীন পালনের স্বাধীনতা থাকতে হবে।—শারয়ি সম্পাদক

ঘরের খাইখরচের চিন্তায় নাকাল হতে হয়। এত খাটলাম, সব পরীক্ষায় এত ভালো করলাম, এত গবেষণা দেখালাম। জানপ্রাণ দিয়ে পিএইচডিটাও শেষ করেছি। কিন্তু এখন দেখো কী অবস্থা! আমি একদম ভেঙে পড়েছি। এই দেশ ছাড়তে পারলে বাঁচি।'

এত অবিশ্বাস্য অ্যাকাডেমিক অর্জনের পরও ইউসুফ আজ অসহায়। ইউসুফের সব স্বপ্ন যে আজ ভেঙে চুরমার তা বোঝা যায় তার পরের কথায়—'আমার নিজেকে আর মানুষ মনে হয় না। পিএইচডি করো, পরীক্ষায় ভালো করো, দুনিয়া তোমার হাতের মুঠোয় আসবে। এই স্বপ্নই তো আমরা আমাদের বাচ্চাদের দেখাই, তাই না? এগুলো সব ডাহা মিথ্যা কথা। একবিন্দুও সত্যি নয়।'

☆☆☆

পুরো পৃথিবীজুড়ে মানুষজন বড় বেশি নির্ভর করে অ্যাকাডেমিক ব্যবস্থায়। সবকিছুর জন্য আছে সনদ। একটা বিষয় যদি আমরা না জানি, জানতে চাই। ভাবি, ওই বিষয়ে সার্টিফিকেট পেলেই বুঝি কেল্লা ফতে! ডাক্তারি বা অর্থনীতির মতো বিষয়গুলোতে লোকজনের সাফল্য থেকে আমাদের মাঝে তৈরি হয়েছে ওই ধারণা। কিন্তু ভালো রেজাল্ট হলেই সব বিষয়ে এমন সফলতার গ্যারান্টি নেই।

সম্পদ গড়তে লাগে টাকাপয়সার সাথে ভালো বোঝাপড়া। কিন্তু প্রায় সব এমবিএ পাঠ্যসূচিতে এ বিষয়ে কোনো কথা নেই। উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষদের পঙ্গু করে দেয় এই অসংগতিগুলোই।

ইউনিভার্সিটির গণ্ডি পার করেও ছেলেমেয়েরা টাকাপয়সার হিসেব নিয়ে হরহামেশা বিপদে পড়ে। পয়সা না জমানো আর পয়সা না কামানোর বদভ্যাস তাদের সাথে রয়ে যায় বাকি জীবন। কারণ আর্থিক বিষয়ে সঠিক শিক্ষা তারা কখনোই পায়নি।

এমবিএ পাশ করা বেশিরভাগ লোকই সফল ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়তে নামে না। তারা যতদিনে এমবিএ শেষ করে, ততদিনে দুনিয়া আরো এগিয়ে যায়। নিজেদের দক্ষতা শানাতে 'বাস্তব দুনিয়াতে' যথেষ্ট হাত পাকাতে পারেনি তারা। আর অতদিনে ঋণের বোঝায় অনেকেই জর্জরিত।

কীভাবে আমাদের স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় করব, কীভাবে জীবনসঙ্গীর সাথে

মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলব কিংবা ঠিকভাবে পয়সাপাতি সামলাব—এমন কোনো কোর্স কখনো থাকে না ইউনিভার্সিটিতে। হ্যাঁ থাকলেও, সেগুলো থাকে আলাদা আলাদাভাবে। কিন্তু গতানুগতিক কোনো স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির পাঠ্যসূচিতে এ ধরনের বিষয়গুলো নেই। অথচ একটি সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের জন্য কত দরকারি এগুলো। কিন্তু এগুলোর বদলে আমরা বসে বসে মাথায় ঢালি অপ্রয়োজনীয় সব বিদ্যে। পরীক্ষায় পাসের জন্য তোতাপাখির মতো মুখস্থ করি আরো কত কত জিনিস। জীবনে তৃপ্ত হতে এগুলো জীবনে কিছু যোগ করে না।

টাকাপয়সা আর অর্থনৈতিক দাসত্বের আলাপ আমাদের সমাজে নিষিদ্ধ অনেক দিন যাবৎ। হু-হু করে আমাদের সমাজে বাড়ছে দীর্ঘস্থায়ী বিষণ্ণতার রোগে ভোগা তরুণ। ঋণের রসাতল থেকে পাতালে ডুবছে তারা। স্বাস্থ্যের সমস্যা হচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে তাদের জীবনের মাকসাদ। আমাদের চোখের সামনে দিয়ে পাকিয়ে উঠছে গভীর সংকট। আমাদের সমাজ ডুবছে ঋণে। আপন সমাজের পায়ে আমরা কুড়াল মারছি অর্থনৈতিক সংকট জন্ম দিয়ে। এই কারণেই তৈরি হয় অচলাবস্থা। তারপর বাকিটা জীবন কাটাই সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে।

আমাদের মতো সুবিধা-বঞ্চিত দরিদ্র দেশগুলোতে শিল্পায়নের পাঠ যেদিন থেকে দেওয়া হলো, ঋণ-জর্জর ও অচলাবস্থার মানসিকতাও শুরু হলো সেদিন থেকেই। শিল্পায়নকে ভাবা হয়েছিল আমাদের মুক্তির প্রথম আলো। কিন্তু আসলে এটা আমাদের মনমানসিকতাকে করেছে পুঁজিবাদ-নির্ভর। পুঁজিবাদীরা চেয়েছে শুধু আমাদের শ্রম থেকে ফায়দা পেতে। জীবনের সাফল্য হিসেবে আমাদের কাছে বিক্রি করছে অ্যাকাডেমিক সাফল্য আর 'ভালো একটা চাকরি'র ফানুস।

কাজেই উদ্যোক্তা হওয়া এখন আর কোনো পছন্দ-অপছন্দের বিষয় না; বরং জরুরি। আমাদের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা তরুণদের যথাযথভাবে প্রস্তুত করছে না। প্রযুক্তি আর বিশ্বায়নের ঝড়ো গতি আর চির-বিকাশমান অর্থনৈতিক মডেলের যুগে, আমরা যদি এই দিকে এগিয়ে না আসি, এই দিকে নেতৃত্ব না দিই, তাহলে ধুলোয় মিশে যাব। গ্রুপ হিসেবে পিছিয়ে তো পড়বই, সামগ্রিকভাবে আমরা হব অথর্ব এক জাতি। আসন্ন পরিবর্তনের কিছু স্রোত হবে এত বিশাল—যদি প্রস্তুতি যথাযথ না হয়, পাথরের গায়ে আমরা এমনভাবে আছড়ে পড়ব, আর উঠেই দাঁড়াতে পারব না। উদ্যোক্তা হবার বিষয়টি যদি সামগ্রিকভাবে আমরা আঁকড়ে ধরতে পারি, কেবল তখনই হবে আমাদের সত্যিকার সাফল্যের শুরু।

শিল্পায়নের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার সময় এখনই। চাকরি করার চেয়ে প্রাধান্য দিতে হবে উদ্যোক্তা হওয়াকে। ঋণের বোঝায় কেউ যদি একবার ডুবে যায়, তার চিন্তাশক্তি সংকীর্ণ হতে শুরু করে। এগিয়ে যাবার বদলে তার মাথায় কেবল ঘুরপাক খেতে থাকে, এই পৃথিবীতে সে কীভাবে টিকে থাকবে? মানসিকভাবে এমন পঙ্গু থাকলে আমরা কোনোদিনও সামনে এগিয়ে যেতে পারব না।

ব্যক্তিগত অর্জন হিসেবে 'ভালো একটা চাকরি' যেমন গতকাল শেষ গন্তব্য ছিল, আছে আজও। অথচ সত্যি বলতে ভালো চাকরি বলতে নেই কিছুই। গতকালের চেয়ে আজকের অবস্থা আরো বেশি খারাপ। আপনার রাত যদি কাটে নির্ঘুম ঋণশোধের চিন্তায়, যদি এই ভেবে ভেবে জীবন ক্ষয় হয় যে, কাল সকালে চাকরি থাকবে কি না—এই শক্তিগুলো তাহলে নিজের ব্যবসায় কেন খাটাচ্ছেন না? শুরুটা তো করতেই হয় কোথাও না কোথাও থেকে।

উদ্যোক্তা হয়ে আমরা ফিরে পেতে পারি আমাদের শক্তি। পারি উঠে দাঁড়াতে। কিন্তু আফসোসের বিষয়—আমাদের অনেকে জানেই না যে, নিজের মাঝে সেই শক্তি আদৌ আছে কি নেই।

দাস-ব্যবসা নিয়ে একটা কথা মনে পড়ে গেল। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি মাসের ২৩ তারিখ মিশিগান ইউনিভার্সিটিতে বিষয়টা খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছিলেন ম্যালকম এক্স—

দুই ধরনের নিগ্রো আছে। নতুন আর পুরোনো। পুরোনো নিগ্রোদের সম্পর্কে অনেকেই জানে। দাসপ্রথার ইতিহাসে আপনারা তাদের পড়েছেন 'আঙ্কেল টম' নামে। দাসপ্রথার সময় ছিল দুই ধরনের নিগ্রো—এক. গৃহনিগ্রো, দুই. মেঠোনিগ্রো।

গৃহনিগ্রোরা মনিবের সঙ্গে বাড়িঘরে থাকত। তাদের পোশাকআশাকও ছিল ভালো। মনিবের ফেলে যাওয়া খাবার খেত বলে, তারা খেতও ভালো। তারা থাকত চিলেকোঠা বা তহখানায়। সে যা-ই হোক, মনিবদের কাছাকাছি থাকত অন্তত।

মনিব তার সঙ্গে যতটা না নিজেকে একাত্ম মনে করে, সে তারচেয়ে অনেক বেশি নিজেকে তার সঙ্গে একাত্ম মনে করে। মনিব বলেন, 'আমাদের খাবারদাবার আছে।' গৃহনিগ্রো বলে, 'আমাদের খাবারদাবারের কোনো অভাবই নেই।' মনিব বলেন, 'আমাদের একটা সুন্দর বাড়ি আছে এখানে।' গৃহনিগ্রোও বলে, 'সত্যিই

আমাদের একটা সুন্দর বাড়ি আছে এখানে।' মনিব অসুস্থ হলে পোষা গৃহনিগ্রো বলে, 'হুজুর, কেমন আছেন, আমরা কি অসুস্থ?' 'আমরা অসুস্থ!' মনিবের কষ্ট, তার কষ্ট। তার বদলে মনিব কেন অসুস্থ, এতে তার পীড়া বেশি। মনিবের বাড়িতে আগুন লাগলে, আগুন নেভাতে মনিবের চেয়ে সেই নিগ্রোর তোড়জোড় থাকত বেশি।

কিন্তু আরেক ধরনের নিগ্রো আছে মাঠে। গৃহনিগ্রোরা সংখ্যায় কম। কিন্তু বেশিরভাগ নিগ্রোরা মেঠোনিগ্রো। মনিব অসুস্থ হলে ওরা দুআ করে যেন সে মরে যায়। মনিবের ঘরে আগুন লাগলে ওরা চায় যেন বাতাস এসে আগুন আরো চড়িয়ে দেয়।

কোনো গৃহনিগ্রোকে আপনি যদি বলেন, 'চলো পালাই। আলাদা হই।' আপনার দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকে সে বলবে, 'তোমার কি মাথা খারাপ? আলাদা হওয়া বলতে কী বোঝাচ্ছ তুমি? এরচেয়ে ভালো বাড়ি আমি কোথায় পাব? এরচেয়ে ভালো পোশাক আমি কোথায় পরতে পারব? এখানকার চেয়ে ভালো খাবার আমি কোথায় খেতে পারব?' এই হলো গৃহনিগ্রো।

কিন্তু মেঠোনিগ্রোদের যদি বলেন, 'চলো আলাদা হই। চলো পালাই।' সে কখনো এটা বলবে না যে, 'কোথায় যাব?' বরং সে বলবে, 'পালাতে পারলেই বাঁচি।'

এখন এই বিংশ শতাব্দীতে উদ্ভব হয়েছে নতুন ধরনের গৃহনিগ্রোদের—বিংশ শতাব্দীর আঙ্কেল টম। আজ থেকে একশো কি দুশো বছর আগের আঙ্কেল টমের সাথে এদের কোনো ফারাক নেই। পার্থক্য শুধু এরা আধুনিক আঙ্কেল টম। আগের আঙ্কেল টম মাথায় পরত রুমাল। আর এখন পরে হ্যাট। এখন সে চালাক। ঠিক আপনার মতোই পোশাক পরে। কথা বলে ঠিক আপনার ভাষাতেই। বরং আপনার চেয়েও ভালো বলার কসরত করে। উচ্চারণটাও করে হুবহু। আপনি বলেন, 'তোমাদের বাহিনী'। কিন্তু ও বলে 'আমাদের বাহিনী'। ওকে বাঁচানোর কেউ নেই। কিন্তু আপনি যখনই বলেন 'আমরা', সেও বলে 'আমরা'।

'আমাদের প্রেসিডেন্ট', 'আমাদের সরকার', 'আমাদের সিনেট', 'আমাদের কংগ্রেসম্যান', 'আমাদের এই, আমাদের সেই'—অথচ ওই 'আমাদের' একেবারে শেষের দিকেও তার কোনো জায়গা নেই। এই হলো বিংশ শতাব্দীর নিগ্রো। আপনি যখন বলেন, 'তোমরা', সে সাথে সাথে তাল মেলায়। আপনি বলেন, আপনি সমস্যায় আছেন। আর সে বলে, 'হ্যাঁ, আমরা সমস্যায় আছি!'

কিন্তু পটে আরেক ধরনের কালো মানুষ আছেন। আপনি বলেন, আপনি সমস্যায় আছেন। সে-ও বলে, 'হ্যাঁ, আপনিই সমস্যায় আছেন।' সে আপনার সঙ্গো তাল মেলায় না।

আজ আমরা যে আর্থিক দাসত্বে আছি, ম্যালকম এক্সের ভাষণটায় তার অনুপম উপমা রয়েছে।

প্রথম যখন ভেবেছিলাম আমি আর আব্বু মিলে যে ব্যবসা দাঁড় করিয়েছি সেটা থেকে সরে যাব, এক আঙ্কেলের কাছে গিয়েছিলাম উপদেশ নিতে। তার নতুন কেনা মার্সিডিজের পেছনে বসে তিনি আমাকে যে কথাগুলো বলেছিলেন, আজও স্পষ্ট মনে আছে সব। তিনি বলেছিলেন, 'দুয়েক বছর চাকরি করো। কিছু অভিজ্ঞতা নাও আগে।'

বছর খানেক বাদে, প্রায় ৯ মাস চাকরির পরে সফল আরেক উদ্যোক্তার কাছেও পেয়েছি একই পরামর্শ—'আমার মনে হয় তোমার আগে এমবিএ-টা করা দরকার। তারপর ভালো কোনো চাকরিবাকরিতে ঢোকো। এরপর না হয় ব্যবসায় নামার চিন্তা কোরো।'

ম্যালকম এক্স যে 'গৃহদাস'দের কথা বলেছিলেন, ওই জায়গাটায় 'আর্থিক দাস' কথাটা বসান। দেখবেন জোরে জোরে বাজতে শুরু করবে বিপদঘণ্টা!

অগ্রপথিক

[লক্ষ্য যখন মানবতার কল্যাণ]

> সমাজের ক্ষুদ্র কোনো চিন্তাশীল নিবেদিতপ্রাণ গোষ্ঠী দুনিয়া বদলাতে পারবে কি পারবে না—এ নিয়ে কখনো সন্দেহ করবেন না । সত্যি বলতে কি—পরিবর্তনগুলো সবসময় এভাবেই হয়েছে।—মার্গারেট মিড

এক লোক নিজের বেডরুম থেকে শুরু করেছিলেন অনলাইন জুতোর দোকান। তার দোকান থেকে কোনো জুতো কিনলে সেটা রিটার্ন করার সুযোগ থাকত গুনে গুনে ৩৬৫ দিন! মানে ধরুন, কেউ জুতো কিনল জানুয়ারি মাসে। ১০ মাস পর তিনি যদি সেটা ফেরত দিতে চান—পারবেন। আরো মজার বিষয় হলো, পাঠানোর জন্য একটা টাকাও খরচ করতে হবে না তাকে।

কোম্পানির গ্রাহকসেবাও ছিল নজর কাড়ার মতো। কর্মীদের বলে দেওয়া থাকত, তারা যেন কল শেষ করতে কখনো তাড়াহুড়ো না করে। গ্রাহককে 'খুশি' করতে যতক্ষণ লাগে লাগুক। একবার তো একটি কল চলেছিল ৯ ঘণ্টা! ভাবা যায়, ৯ ঘণ্টা!

এক ভদ্রমহিলার মা ছিলেন খুব অসুস্থ। দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি। তিনি মায়ের জন্য ৬ জোড়া জুতো কিনলেন। ভাবলেন, জুতো দেখে মা বুঝি খুশি হবেন! কিন্তু পরের দুই সপ্তায় মায়ের শরীরটা আরো বেশি খারাপ হয়ে গেল। মহিলা ভাবনায় পড়ে গেলেন। এতগুলো জুতো নিয়ে তিনি এখন কী করবেন? সিদ্ধান্ত

নিলেন, জুতোগুলো ফেরত দিয়ে দেবেন। গ্রাহকসেবা বিভাগ ফেরত দেওয়ার কারণ জানতে পেরে অদ্ভুত এক কাজ করে বসল। তারা ওই ভদ্রমহিলার মায়ের জন্য পাঠাল এক তোড়া ফুল। আর কার্ডের মাধ্যমে উইশ করল—গেট ওয়েল সুন! আর জুতোগুলো তারা হাসপাতাল থেকেই ফেরত নিলেন কোনো খরচ ছাড়াই। সেই সাথে ভদ্রমহিলার অ্যাকাউন্টটিকে করে দিলেন ভিআইপি। এই কোম্পানির গ্রাহকেরা সবচেয়ে খুশি থাকবেন না তো আর কারা থাকবে!

তাদের কর্মীনিয়োগ প্রক্রিয়াটিও বেশ বৈচিত্র্যময়। নতুন যোগ দেওয়া সবাইকে অন্তত সপ্তাখানেক কাজ করতে হয় গ্রাহকসেবা বিভাগে—তা সে হোক ম্যানেজার, প্রোগ্রামার কি অ্যাকাউন্টেন্ট। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের একটা সুযোগ দেওয়া হয়। যতদিন কাজ করেছে ততদিনের বেতন, সাথে ২ হাজার ডলার বোনাস নিয়ে তারা চাইলে চাকরিটা না-ও করতে পারে। নতুন কর্মীরা এতে খুব সহজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে, চাকরিটা করে তারা আনন্দে থাকতে পারবে কি না। পুরো মন লাগিয়ে কোম্পানির কাজ করে যেতে পারবে কি না।

এই কোম্পানির নাম জ্যাপোস (Zappos)। তাদের কর্মীসংখ্যা ১৫ শয়েরও বেশি। ২০০৯ সালে অ্যামাজন এটা কিনে নেয় ১.২ বিলিয়ন ডলারে!

কোম্পানির এ ধরনের চমকপ্রদ নিয়মকানুনের ব্যাপারে জ্যাপোসের প্রধান নির্বাহী টনি শে বলেছেন—

'বেশিরভাগ কর্মক্ষেত্রে মানুষের ভেতরকার প্রতিভা আজীবন চাপা থেকে যায়। আমি চাই সেটা বেরিয়ে আসুক। আমি এমন একটা পরিবেশ দিতে চেয়েছি সবসময়, যেন প্রতিটি মানুষের নিজস্ব গুণ ও যোগ্যতা বেরিয়ে এসে সবার মাঝে আলো ছড়িয়ে দেয়।'

☆☆☆

এক কিশোরের স্বপ্ন সে গ্রাফিক ডিজাইনার হবে। কিন্তু কাজ পাচ্ছে না। লোকে মনে করে সে 'বাচ্চা'। স্থানীয় কিছু কোম্পানিতে সে গিয়ে ধরনা দিয়েছে। কিন্তু তারা জানতে চায় সে আগে কোনো কাজ করেছে কি না। অনেকটা ডিম আগে না মুরগি আগে ধরনের সমস্যা।

একদিন সে ঠিক করল, একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের জন্য সে ডিজাইন করে দেবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। তার মনে হলো এতে একদিকে কাজটা যেমন কল্যাণকর হবে, পাশাপাশি তার অভিজ্ঞতার ঝুলিটাও ভরে উঠবে। তার প্রতি মানুষের আস্থা তৈরি হবে।

অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের মালিক পছন্দ করলেন তার কাজ। তিনি অন্যদের কাছে বললেন তার কাজের কথা। ধীরে ধীরে সেই কিশোরের হাতে আসতে লাগল সম্মানীসহ কাজ।

অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে কাজ করে যেহেতু ফায়দা এসেছে, সম্মানীসহ কাজের পাশাপাশি সে অর্ধেক সময় দিতে লাগল অন্যান্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানে। মানুষজনের কাছে ছড়িয়ে পড়ল তার কাজ আর প্রতিভা। সে তখন আর 'বাচ্চা' রইল না। এখন সে একজন পুরোদস্তুর প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইনার। নিমিষেই দৃষ্টিনন্দন লোগো আর মনকাড়া লিফলেট বানানোই তার কাজ।

নিজের কাজে এই কিশোর খুব মজা পেত। ধীরে ধীরে তার কাজের শান বাড়ল আরো। ঠিক করল এমটিভি অ্যাওয়ার্ড প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। আর কী আশ্চর্য, প্রথম পুরস্কারটা তার ঝুলিতেই ঠাঁই করে নিল। দিকে দিকে আরো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল তার প্রতিভার খবর। তার হাতে আসতে লাগল নতুন নতুন সব কাজ।

তার ডিজাইন কোম্পানিতে এখন সাড়ে ৩ শয়ের ওপরে কর্মী আর স্বেচ্ছাসেবী কাজ করে দুনিয়াজুড়ে। ডিজনি আর ইউনিসেফের মতো ক্লায়েন্ট আছে তার। তবে এখনো তার প্রতিষ্ঠান 'ভেরিনাইস' (VeryNice) ধরে রেখেছে ফিফটি-ফিফটি বিজনেস পলিসি—অর্ধেক কাজ সম্মানীসহ। বাকি অর্ধেক সময় অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে। ২০১৪ সাল নাগাদ প্রায় ২ মিলিয়ন ডলারের মতো কাজ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করে দিয়েছে ভেরিনাইস।

☆☆☆

শুনলে অবাক হবেন, ক্যালিফোর্নিয়াতে মোট উৎপাদিত টমেটোর ২৫% প্রক্রিয়াজাত করে যে কোম্পানি তাদের কোনো ম্যানেজার নেই। এই কোম্পানিতে কারো কোনো পদবি নেই, নেই পদোন্নতি বা 'ওপরের মহল'। এখানে সবাই নিজে নিজের বস। অন্যের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সিদ্ধান্ত নেয় তারা নিজে নিজে।

কোম্পানির টাকা ব্যবহারের সুযোগ আছে প্রতিটি কর্মীর। প্রয়োজনে যেকেউ খরচ করতে পারে সেখান থেকে। কোনো কনিষ্ঠ কর্মী যদি দেখে কোম্পানীর স্বার্থে ২ হাজার ডলারের চেক লিখে দিতে হবে, তার সেই অধিকার আছে।

অবশ্য এই কোম্পানির যে একক কোনো লিডার নেই তা নয়; কোম্পানির সুনির্দিষ্ট রূপকল্পও রয়েছে। তবে অন্য চিরাচরিত কোম্পানিগুলোর মতো এখানে নেই আদেশ আর নিয়ন্ত্রণ স্তরবিন্যাস। এখানে কেউ কাউকে তার কাজের জবাবদিহি করে না। কারো কাজের জন্য নেই মূল্যায়ন বা মতামত। কী করতে হবে বলা হয় না কাউকে। কর্মীরা নিজেরা নিজের চালক। যা করা দরকার তারা তা-ই করে।

মর্নিং স্টার নামের এই কোম্পানির বার্ষিক আয় ৭ শ মিলিয়নের ওপরে।

☆☆☆

এই যে জ্যাপোস গ্রাহকসেবায় সবচেয়ে নজর দেয়, ভেরিনাইস দাতব্য প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে কাজ করে, আর কর্মীদের সমতার বেলায় মর্নিং স্টারের দর্শন—এরকম প্রতিষ্ঠান কিন্তু সংখ্যায় একটা-দুইটা নয়। বহু প্রতিষ্ঠানে আছে এ ধরনের এমন কিছু রীতি যা পুরোপুরি মিলে যায় ইসলামি আদর্শের সাথে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, সেগুলোর কোনোটারই প্রতিষ্ঠাতা মুসলিম নন।

গ্রাহককে খুশি করা, কর্মীদের খুশি রাখা, পৃথিবীতে অর্থবহ পরিবর্তন নিয়ে আসার প্রতি এই যে অন্তপ্রাণ চিন্তা—এই ধরনের মানসিকতাকে বলে 'ভ্যালি' মানসিকতা। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া, যেখানে প্রথম উচ্চারিত হয় এই নাম—দা সিলিকন ভ্যালি কাঠামো বা 'ভ্যালি' মানসিকতা কিন্তু শুধু ওখানেই আটকে নেই। ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ড—নিত্যনতুন উদ্ভাবন আর ব্যবসার আঁতুড়ঘর যত জায়গা সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে এই মনোভাব। এদের নীতি ঠিক করার ধরন ঠিক এরকম—আমরা সবসময় একটা কাজ 'এইভাবে' করে এসেছি কিংবা একটা কাজ 'এইভাবে আর এইভাবে' করা হয়। কিন্তু চলো এখন নতুন করে ওই প্রক্রিয়াগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করি।

এরকম চিন্তার ফলে তৈরি হয় এমন সব কোম্পানি যারা সমাজের চিরাচরিত পরিচালন-পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে। বের করে আনে এতদিন ধরে রয়ে যাওয়া ধাঁধার সমাধান।

এ ধরনের চিন্তা থেকে তৈরি হয় অধিকতর মানবতাবোধসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। ইসলামের সোনালি সময়ে এমনই ছিল মুসলিমেরা। তারা চিন্তা করতে পারত বাক্সের বাইরে গিয়ে। ভ্যালি মানসিকতার সঙ্গে ইসলামের অদ্ভুত মিল থাকায় আমি সবসময় এটার কদর করি। আমাদের জাতির পিতা নবি ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তো এই কাজটিই করেছিলেন—দাঁড়িয়েছিলেন সমাজের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে। অন্ধের মতো তিনি অনুসরণ করেননি বাপদাদার ধর্ম।

খ্যাতিমান ব্যবস্থাপনাবিদ পিটার ড্রাকার বলেছিলেন, সমাজের সমস্যা সমাধান ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য। বহু ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের কর্ণধারেরা বুঝেছিলেন, সমাজে কোন জিনিস কীভাবে কাজ করে সেটা নিয়ে ঠিক প্রশ্নটি করা গেলেই সমাজের সমস্যার সমাধান পাওয়া সম্ভব।

ইসলামের সাথে ভ্যালি মানসিকতার এই একটাই মিল না; আরো আছে। এই মানসিকতা চায় এসব সমস্যার সুরাহা করবে সবচেয়ে যোগ্য লোক। আর করবে সব থেকে সেরা উপায়ে। কর্মী, গ্রাহক, পরিবেশ আর সর্বোপরি সমাজের সবার মঙ্গলে কাজ করে তারা। সাধারণত বড় বড় কোম্পানিগুলোতে দেখা যায় এর ভিন্ন ছবি—লোভই মূল কারিগর এসব জায়গায়।

ভ্যালি মানসিকতা নিয়ে যারা কাজে নামে, তাদের প্রথম লক্ষ্য থাকে কীভাবে তারা গ্রাহকের সমস্যা সুরাহা করবেন। তবে সাথে সাথে তার মাথায় এটাও থাকে, কীভাবে তার কর্মীরা আনন্দে থাকবে, গ্রাহকরা খুশি হবে, সবকিছু কীভাবে সবচেয়ে সুন্দর হবে। ইসলাম তো এটাই চায়।

জীবনের প্রতিটি পরতে ইসলাম চায় ইহসান ও ইনসাফ। প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বিষয়ের প্রতি ইহসান (সম্ভাব্য সবচেয়ে ভালোভাবে সম্পাদন) করাকে অত্যাবশ্যক করেছেন...।'[১] ইসলাম বলে আপনি যা-ই করবেন সবচেয়ে ভালোভাবে করবেন। বাচ্চা মানুষ

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১৯৫৫; *সুনানু আবি দাউদ* : ২৮১৫; *জামি তিরমিযি* : ১৪০৯; *সুনানুন নাসায়ি* : ৪৪০৫, ৪৪১১, ৪৪১২, ৪৪১৩, ৪৪১৪; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩১৭০; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৭১১৩, ১৭১১৬, ১৭১২৮, ১৭১৩৯; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৫৮৮৩, ৫৮৮৪; *মুসতাখরাজু আবি আওয়ানাহ* : ৭৭৩৭, ৭৭৩৮, ৭৭৩৯, ৭৭৪৬, ৭৭৪৭; *আস-সুনানুল কুবরা*, নাসায়ি : ৪৪৭৯, ৪৪৮৫, ৪৪৮৬, ৪৪৮৭, ৪৪৮৮, ৮৬০৪; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ৩০২২, ১৬০৭৭, ১৮০৪৪, ১৯১৩৭, ১৯১৩৮

করলে সবচেয়ে ভালোভাবে; ঘরদোর পরিষ্কার করলে সবচেয়ে ভালোভাবে; বই লিখলে বা ব্যবসা করলে—সবকিছুই সবচেয়ে ভালোভাবে। আমাদের কথা এবং আমাদের কাজের প্রভাব যে অনেক দূর গড়ায়, তা আমাদের বুঝতে হবে। যখন চেষ্টা হবে সেরা, ইনশাআল্লাহ আশা করি, ফলও হবে সেরা।

মুসলিম উদ্যোক্তারা তাদের সামর্থ্যের শেষ বিন্দুটুকু দিতে বাধ্য। সবকিছু করতে হবে সম্ভাব্য সব থেকে সেরা উপায়ে। ব্যবসার প্রতিটি ক্ষেত্রে ধরে রাখতে হবে এই চর্চা। কর্মীদের সাথে দুর্ব্যবহার করা যাবে না। গ্রাহকদের সামলাতে হবে উদার মানসিকতা নিয়ে। সর্বোপরি থাকতে হবে সমাজের মঙ্গল-চিন্তা।

ইসলাম চায় আমরা যেন মহাসত্যের সন্ধানে নামি। আমাদের লক্ষ্য যেন থাকে আকাশ ছোঁয়ার। ইসলাম চায় সমস্যার সমাধানে নিয়োগ করা হবে সবচেয়ে উপযুক্ত লোক।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আশেপাশে যাদের রেখেছেন, তারা সবাই ছিলেন অত্যন্ত সৎ; প্রিয় নবিজির প্রচণ্ড অনুগত। মানুষকে তিনি তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতামাফিক কাজ দিতেন। মাদিনাতে মসজিদ গড়ার সময় তিনি দেখলেন তাল্‌ক ইবনু আলি আল-ইয়ামামি রাযিয়াল্লাহু আনহু প্লাস্টারের কাজটা ভালো পারেন। তখন তাকে দিয়ে তিনি আর ইট আনা-নেওয়া করালেন না। প্লাস্টারের কাজে লাগিয়ে দিলেন তাকে।[১]

সেজন্যই বলি, পৃথিবীকে আরো সুন্দর করতে একজন মুমিনের জন্য উদ্যোক্তা হবার চেয়ে আর ভালো কোনো বিকল্প নেই।

[১] *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, ইবনু সাদ, খণ্ড : ৬; পৃষ্ঠা : ৭৭; *ইমতাউল আসমা*, তাকিউদ্দিন আল-মাকরিযি, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ৯০; *ওয়াফাউল ওয়াফা*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৫৭

গৎবাঁধা চিন্তার হোক অবসান

[গড়ে তুলুন আলোকিত সমাজ]

> গোলাম মন ভাবে, 'কাজটা কি বৈধ?' মুক্তমন বলে, 'কাজটা কি ঠিক?'
> —জনৈক ব্যক্তি

একটি আইনি প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেয়েছে ইবরাহিম। অফিসের সবকিছু পরিচ্ছন্ন রাখা তার কাজ। চাকরির শুরুতে তাকে হালকা জ্ঞান দেওয়া হয়েছে অফিসের কাজকর্ম নিয়ে। এই অফিসের উকিলদের সাফল্যের হার অনেক। এখানে যারা জ্যেষ্ঠ আইনজীবী, তারা ওকালতি পেশায় আছেন এক যুগেরও বেশি সময় ধরে।[১]

---

[১] বর্তমান সময়ে ওকালতির পেশা ইসলাম-অনুমোদিত নয়; এমনকি সৎভাবে চললেও নয়। কারণ এতে আল্লাহর আইনের বিপরীতে মানবরচিত আইনের পক্ষে কথা বলতে হয়, সেটার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হয়, এ বিচারব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত বিচারকদেরকে এ মানবরচিত আইনে বিচার করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়; এমনকি বিশেষ কোনো মামলায় বিচারক ব্যক্তিগত উদ্যোগে যদি শারিয়া আইনে বিচার করতে চায়ও, তবু বাদী কিংবা বিবাদীর আইনজীবী সেটার বিপক্ষে পরিষ্কার অবস্থান নেবে। নিজের বক্তব্যকে প্রমাণ করতে এবং মক্কেলকে বাঁচাতে ঠিকই সে মানবরচিত আইনের আশ্রয় গ্রহণ করবে।

নিঃসন্দেহে এসবই হলো কুফর, যার সাথে ঈমানের ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক নেই। ব্যক্তি কাফির হবে কি না, সেটা ভিন্ন বিষয় (কারণ কুফরের ভিত্তিতে কাউকে কাফির প্রমাণ করতে কুফর ছাড়াও আরো কিছু বিষয়ের প্রয়োজন হয়, যার বিস্তারিত বিবরণ তাকফির-সংক্রান্ত বইগুলোতে উল্লেখ করা আছে।) কিন্তু কর্ম যে কুফর সে ব্যাপারে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই। এমন কুফরি-ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত কোনো কাজ বা চাকরি করা কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ হতে পারে না। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি অন্তরে এ কুফরি-ব্যবস্থার প্রতি পরিপূর্ণ ঘৃণা-বিদ্বেষ রেখে দ্বীনি ভাইদের মুক্তির উদ্দেশ্যে, মজলুমদের পক্ষে সৎভাবে কাজ করার লক্ষ্যে প্রচলিত

কাজ শুরুর পর ইবরাহিম নিজেই প্রমাণ পেয়েছে এসব কথার। এখানকার জ্যেষ্ঠ উকিলরা এমন এমন সব মামলা নিত, মনে হতো সেগুলো জেতা না-মুমকিন। কখনো কখনো অনৈতিক মামলাও নিত তারা। কিন্তু শেষে এজলাস থেকে জিতে ফিরত ঠিকই।

মাস দুয়েক হয়েছে ইবরাহিমের কাজের। একদিন সে দেখল পরের মাসের সাফ করার কিছু জিনিস এখনো এসে পৌঁছায়নি। এরকম হলে ঠিকঠাক পরিষ্কার করা যাবে না সামনে। অফিসের হিসাব বিভাগকে সে জানাল, প্রতিমাসের বিলগুলো যেন একবারে সব ঠিক করে রাখা হয়। তা হলে মাসের জিনিস আর মাসে আসতে দেরি হবে না।

মাস দুই পর সে দেখল কোনো এক কারণে বিল বন্ধ আছে। অফিসের সিইও'র নির্দেশ। তার ধারণা ইবরাহিম পুরো বছরের বিল করতে বলায় তাদের বড় ক্ষতি হয়েছে। অথচ সে শুধু বলেছিল বিলটা অটোমেটিক করতে। তারপরও ক্ষতিটা মোটেও অত বড় না যত বড় করে তিনি দেখছেন। কাউকে দোষ দিতে হবে, সেজন্যই এই ক্ষতির দোহাই দিয়ে বিল বন্ধ করেছেন তিনি।

মানুষ আসলে তার অভ্যাস এবং তার পরিবেশের যোগফল। আমাদের কাজকর্ম, যে পরিবেশ আমরা বেছে নিই তার সরাসরি প্রভাব পড়ে আমাদের মনের ওপর। মানুষের পেশা আর তার স্বভাবচরিত্রের মাঝে পরিষ্কার সম্পর্ক আছে।

আইনি এই প্রতিষ্ঠানটি যারা চালান, যেকোনো তর্কে জিততে জিততে তারা এত অভ্যস্ত, নৈতিকতার কোনো বালাই নেই তাদের কাছে। তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার এক ক্ষত এটা। তারা তাদের কাজের নৈতিক দিকটি নিয়ে একদমই বেখেয়াল। এরই প্রভাব পড়েছে তাদের মনে, তাদের বিচারে।

আমাদের অভ্যাসগুলো নিয়ে আমাদের হুঁশিয়ার হওয়া চাই। কোন পরিবেশে আছি তা নিয়ে হওয়া দরকার আরো সতর্ক। আমাদের ঈমান আমাদের অন্তরের সাহারা হবে, এমন সব অভ্যাস আর পরিবেশ পছন্দ করতে হবে আমাদের।

আইন নিয়ে পড়াশোনা করে আইনজীবী হয় এবং ওকালতির পেশায় যুক্ত হয়, তাহলে একান্ত জরুরতবশত সেটা সীমিত পরিসরে তার জন্য অনুমোদিত। এমন বিশেষ অবস্থা ছাড়া সাধারণভাবে প্রচলিত আইন নিয়ে পড়াশোনা এবং এসংক্রান্ত চাকরি থেকে প্রতিটি মুসলিমের দূরে থাকা একান্ত আবশ্যক।—শারয়ি সম্পাদক

বাছবিচার করে চলতে যে জিনিস যেমন আছে তাকে সেভাবে গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হয়। উদ্যোক্তারা অবশ্য স্বভাবগতভাবেই সমাজের প্রচলিত রীতিপ্রথার পরোয়া করে না।

অনেক উদ্যোক্তাতার সাথে কথা হয় আমার। তারা যে শুধু সমাজের গৎবাঁধা নিয়মনীতিকে চ্যালেঞ্জ করে তা-ই নয়, বদলে ফেলে নিজের জীবনকেও। শুরু থেকেই আর দশটা আদরের দুলালের মতো নয় তাদের জীবন। তাদের মনমানসিকতা আচার-স্বভাব জীবনধারা কেমন অন্যরকম। খাদ্যাভ্যাস বলুন, স্বাস্থ্য-সচেতনতা বলুন কিংবা কাজ আর প্রোডাক্টিভিটির ব্যাপারে তাদের চিন্তাধারা বলুন—সবকিছুতে তাদের মধ্যে রয়েছে প্রচলিত রীতির বাইরে যাবার ঝোঁক। এটাই তাদের উদ্বুদ্ধ করে নতুন কিছু সৃষ্টিতে।

আফ্রিকায় ম্যালেরিয়া দূর করতে বিল গেইটস খরচ করছেন বিশাল পরিমাণ অর্থ। কাজটি করতে তিনি যতটা নিবেদিত ছিলেন ওখানে, তেমনটা করেনি আর কেউ। শিক্ষার উন্নয়নে জড়িয়ে আছেন তিনি। কাজ করছেন শিশুশিক্ষার বর্তমান ধারাটি বদলে ফেলতে। তবে তার শুরুটা কিন্তু এরকম মানবকল্যাণমূলক কিছু ছিল না। তার শুরু হয়েছিল প্রতিটি টেবিলে একটি করে পিসি থাকার লক্ষ্য নিয়ে।

স্টিভ জবসের জনহিতকর কাজকর্ম সম্বন্ধে আমরা অত জানি না। তবে এটা জানি, তার সময়ে কম্পিউটারের চলতি ধারা নিয়ে তিনি স্বস্তি পাননি; চেয়েছেন বদলাতে। অ্যাপলের হয়ে সৃষ্টি করেছেন নতুন নতুন বাজার। পিসিকে বাস্তব রূপ দেওয়ায় প্রথম কোম্পানি ছিল অ্যাপল। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের উপযোগী করে স্মার্টফোন আর ট্যাবলেট তারাই এনেছে প্রথম। সমাজের প্রথা বদলের অদম্য আগ্রহ থেকেই সম্ভব এমনতর প্রেরণা আর অর্জন।

খণ্ডকালীন ইমামের চাকরি করা এক ভাই আমাকে একবার বলেছিলেন, ‘আপনাকে বাতাসের গতি বুঝতে হবে। পরিবেশের হাল-হাকিকত ধরতে হবে। কিন্তু এর মধ্যে আটকে গেলে হবে না; পেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, অনেকেই এটা করতে পারেন না। কারণ এভাবেই শিখে বড় হয়েছি আমরা। এই কাজটা যারা সবচেয়ে ভালো পারেন, তারা হলেন উদ্যোক্তারা। চলতি বাতাসেই তারা কাজ করেন। কিন্তু জানেন যে, ওসব পাথরে খোদাই করা না। তাদের জীবন আর তাদের উদ্যোগ ওসবে বন্দি থাকতে বাধ্য না। আরেকদল যারা এই কাজগুলো পারেন তারা

হলেন মুমিন—খাঁটি বিশ্বাসীরা। তারা জানেন, জবাবদিহিতা শুধু আল্লাহর কাছেই। আর কারো পরোয়ার দরকার নেই। তারা শক্তিমান, পরিবর্তনে আগ্রহী। আপনি মানসিকভাবে কোনো কিছুতে বন্ধ নন। আপনি প্রচলিত প্রথা মানেন ঠিকই। কারণ ওতে সমস্যা নেই, ওটা কাজ করে। কিন্তু আপনার নজর থাকবে ওটাকে ছাপিয়ে দূরে আরো বহুদূরে।'

কেন আমরা ব্যবসা করব?

[সোনাঝরা দিনের হাতছানি]

> নতুন পথ যে পায়, সে-ই তো দিশারী—হোক না সেই পথের সন্ধান পরে আরো অনেকেই পেয়েছে। সামসময়িক লোকদের চেয়ে যে এগিয়ে থাকে বহুদূর, সে-ই তো নেতা। যদিও শতাব্দী পেরিয়ে যায় তার এই পরিচয় বের হতে।
> —ইবনু খালদুন

ঠিক এই মুহূর্তে আমার কাছে ৭টি অনুরোধ আছে দান করার। জাতীয় আন্তর্জাতিক পরিসরে সামাজিক কারণে দান করার প্রয়োজন দিনদিন শুধু বাড়ছেই মুসলিম উম্মাহর জন্য। আর্থিক চাহিদা যেমন বাড়ছে; বাড়ছে যোগ্য লোকের চাহিদাও।

ক্লায়েন্টদের সাথে পরিকল্পনা নিয়ে মিটিংয়ে আমি সবসময় জিজ্ঞেস করি এই মুহূর্তে তাদের চ্যালেঞ্জ কী। তাদের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য কী। দেখা যেত প্রথম প্রথম অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার পরামর্শ দিতে হতো। পরিস্থিতি এমন হলো, এই প্রশ্ন আর জিজ্ঞেসই করতাম না। উলটো মজা করে বলতাম, 'তহবিল সংগ্রহ করতে হবে না নিশ্চয়ই, তাই না?'

দ্বিতীয় যে-সমস্যার কথা তারা বলত তা হলো, সহায়তার অভাব।

অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলো কেমন প্রচার-প্রচারণা চালাতে পারে তার ওপর অনেকটা নির্ভর করে সহায়তা পাওয়া না-পাওয়া।

চ্যালেঞ্জগুলো সমস্যার একটা বড় অংশ; কিন্তু সব না।

সত্যিকার সামাজিক পরিবর্তনে বড় ধরনের সহায়তা-সমর্থন লাগে। আমাদের উম্মাহ যদি চাকরি-বাকরি নিয়েই পড়ে থাকে, তা হলে পরিবর্তনের স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে।

শিল্পোদ্যোগগুলোর মাঝে আছে এই সহায়তা-সমর্থন দেওয়ার সম্ভাবনা। যে কারণে এসব উদ্যোগে আরো বেশি করে এগিয়ে আসা উচিত মুসলিমদের। সময় এসেছে মুসলিমদের ঘরে ঘরে যেন অন্তত একজন ধনী উদ্যোক্তার দেখা মেলে।

কিন্তু দুঃখের কথা কী জানেন? গত পনেরোটা বছর মুসলিমদের ব্যবসাগুলোতে মানবতার বিষয়গুলো খুব কমই দেখেছি। ভ্যালি মানসিকতা তারা জানেই না। আর জানলেও তার বাস্তবায়ন রয়ে যায় শুধু ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনায়। গ্রাহক আর কর্মীদের খুশি রাখার ভাবনা কেবল মুখের কথাতে। লাভ করাই তাদের মূল চিন্তা। কিন্তু তারা বোঝেন না, ব্যবসায় মানবিক দিকগুলো ঠিক রাখলে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুসরণ করলে লাভ হতো আরো অনেক বেশি।

এক অলংকার-ব্যবসার কর্ণধার সামিনার সাথে আমাদের কথা হয়েছিল প্রচারণা-কৌশল নিয়ে। তিনি বলেছিলেন, 'আমার কথা শুনে কিছু মনে করবেন না; আমি ঠিক করেছি, আমার পণ্যের প্রচার আমি মুসলিমদের কাছে করব না। অবশ্য তাদের কাছেও এগুলোর চাহিদা আছে ।

আমার মনে হয় ব্যবসার জন্য আমাদের নিজের সম্প্রদায়ের চেয়ে খারাপ আর কেউ নেই। দাম নিয়ে এরা সবার আগে আপত্তি করবে। দর কষাকষি করবে। আমার পণ্যগুলো মার্কেটের ওপরের দিকের পণ্য। আমি ওপরের শ্রেণিতে এর প্রচারণা চালাতে চাই। আমি মনে করি, আমি যে ধরনের পণ্য বানাই, তা বোঝা বা কদর করার মন-মানসিকতা আমাদের সম্প্রদায়ের নেই।

জানি যা বলছি তা শুনতে ভালো লাগছে না। বলতে আমার খারাপও লাগছে। কিন্তু সত্যি কথা কি—আমি যা বানাচ্ছি তাতে আমার অনেক ভালোবাসা মিশে থাকে। আমি আমার ব্র্যান্ডের অবমূল্যায়ন সইতে পারব না।

জানেন, আমি আমার ওয়েবসাইট করিয়েছি এক অমুসলিমকে দিয়ে? প্রথমে যে ভাইকে দিয়ে করিয়েছিলাম—মাথা খেয়ে ফেলেছিল আমার। তার সাথে কাজ করা কী যে কষ্টের ছিল! সত্যি বলতে আমাদের লোকজনের সাথে ব্যবসা করা দুর্গম গিরি পার করার মতো। পরে আমি আমার ওয়েবসাইট বানালাম এক ইংরেজ নারীকে দিয়ে। তার সাথে কাজ করে ভীষণ মজা পেয়েছি। আমার ওয়েবসাইট নিয়ে আমি এখন খুশি। তাকে পেয়ে সত্যিই ভালো লেগেছে।'

না, মুসলিমদের নিয়ে তার এই কথায় আমি মনে করিনি কিছু। তার এই ভাবনা তার শুধু একার না; আরো অনেকেরই।

বহু দাতব্য সংস্থায় কাজ করা এক ভাই একবার আমাকে বলেছিলেন, 'ম্যানেজমেন্টের বেলায় আমাদের মুসলিমরা সবচেয়ে বাজে। শেষ যে কোম্পানিতে আমি কাজ করেছি, আপনি চিন্তা করতে পারবেন না, স্মার্টফোনের এই যুগে তারা কাগজে ক্রেডিট কার্ডের বিস্তারিত লিখে অনুদান নিচ্ছে।

আমরা কথা দিয়ে কথা রাখি না। আমাদের সময়জ্ঞান নেই। সবসময় দোষ দিই অন্যজনকে। আমাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বা পেশাদারিত্ব একেবারেই নেই। লোকজন যদি জানত দাতব্য সংস্থাগুলোতে বাজে ম্যানেজমেন্টের কারণে কী পরিমাণ টাকা গচ্চা যায়, তারা দান করাই বন্ধ করে দিত।

কর্মীদের বেলায় কী করা হয় আর বলবেন না। এক কোম্পানিতে কিচেন আর টয়লেটে ঢুকতে হয় চাবি নিয়ে দরজা খুলে। কর্মীকে আগে অনুমতি নিতে হয়। এখানেই শেষ নয়। ধরুন, কেউ যদি আসতে দেরি করে, মাসে সব মিলে কত মিনিট হলো তা গোনা হয়। তারপর বেতন থেকে কাটা হয় সেই পরিমাণ টাকা। এরচেয়ে পাশবিক আচরণ আর কী হতে পারে? আমি এটা কোনোভাবেই মানতে পারি না।'[১]

---

[১] এটা ঠিক যে, কাজের নির্ধারিত সময় যদি কেউ পূরণ না করে তাহলে তার বেতন থেকে হিসেব করে সে পরিমাণ বেতন কর্তন করা জায়িয আছে, তবে ইসলাম যে ইহসান, উদারতা ও মানবতার কথা বলে তার সাথে এটা কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কোনো কর্মী হয়তো রাস্তার জ্যামের কারণে, গাড়ি নষ্ট হওয়ার কারণে, অসুস্থতার কারণে অথবা ব্যক্তিগত অন্য কোনো যুক্তিসংগত ওজরের কারণে অফিসে আসতে একটু দেরি করেছে, তাই বলে তার কোনো ওজর-আপত্তি না শুনে কঠোর নিয়মের দোহাই দিয়ে বেতন থেকে তার অনুপস্থিতির সমপরিমাণ বেতন কর্তন করাটা খুবই অমানবিক।

বাস্তবিকই এটা আমাদের মুসলিম সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে চালু আছে, যা আসলে ইসলামি উদারতা ও

আজ থেকে ৩০ বছর আগে মুসলিম সম্প্রদায়ে সমস্যাগুলো যেমন ছিল, গত ১০ বছরে তা বেড়েছে আরো অনেক বেশি। প্রতিদিন আমরা ধুঁকে ধুঁকে মরছি।

অনুদানের জন্য এখনো পয়সাওয়ালা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দিকে মুখ করে থাকে দাতব্য সংস্থাগুলো। অথচ শিল্পোদ্যোগে আমরা উৎসাহ দিই না। কী অদ্ভুত বৈপরিত্ব আমাদের! আমাদের প্রতিষ্ঠান আমাদের সংস্থাগুলো চলে কী নিদারুণ অকার্যকারিতায়! বারবার আমরা ব্যর্থ হই দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য অর্জনে। আগে যা ছিল পরিস্থিতি এখনো আছে তা-ই।

অথচ এই ধরুন মাত্র ২০ কি ৩০ বছর আগে থেকে যদি আমরা শিল্পোদ্যোগে উৎসাহী হতাম, আজকের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠতাম আমরা। আজ ঝানু হয়ে উঠতাম ব্যবসা চালানোয়। আমরা সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠতাম একপাল লোক জড়ো করে সমাজ পরিবর্তনে।

☆☆☆

২৮শে অগাস্ট ১৯২৮। স্কটিশ হাইল্যান্ডে যাত্রা শুরু হলো তেল-বাণিজ্যের গোপন কাহিনির। অ্যাকনাক্যারি প্রাসাদে মিটিংয়ে বসলেন এক ডাচ, এক অ্যামেরিকান আর এক ব্রিটিশ।

ডাচ লোকটি ছিলেন হেনরি ডিটার্ডিং। লোকে তাকে বলত তেল-ব্যবসার নেপোলিয়ন। সুমাত্রায় মাত্রই আবিষ্কার করেছেন এক তেলের খনি। এক ধনী জাহাজ-মালিকের

নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একেবারেই যায় না। কারো ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত অলসতা ও কাজে খিয়ানতের বিষয়টি প্রমাণিত হলে তার বেতন কর্তন করাটা ঠিক ছিল, কিন্তু যৌক্তিক ওজর থাকার পরেও অনেক জায়গায় ওজর গ্রহণ করা হয় না এবং মাসশেষে তার বেতন থেকে অনুপস্থিতির সমপরিমাণ অর্থ ঠিকই কেটে নেওয়া হয়। এটা খুবই জঘন্য ব্যাপার। এমন মানসিকতা আমাদের পাল্টানো উচিত।

যেসব উন্নত বৈশিষ্ট্য আমাদের মুসলিমদের মাঝে থাকা উচিত ছিল, সেগুলো আজ পশ্চিমা বিশ্বের অমুসলিম সম্প্রদায় গ্রহণ করেছে। আর এজন্যই দুনিয়ায় তারা আল্লাহর সবচেয়ে অপছন্দনীয় বান্দা হওয়া সত্ত্বেও পার্থিব সাফল্য তাদের পায়ে লুটিয়ে পড়ছে এবং ক্রমশই তারা উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। লেখক এ বিষয়টির দিকে আমাদের মুসলিম পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন যে, আমরা যেটা করছি সেটা কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না; অথচ অমুসলিমরা ইসলামের হিদায়াত না পাওয়া সত্ত্বেও তারা ইসলামের বেশ কিছু সুন্দর বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পেরেছে, যা তাদের পার্থিব সাফল্যের পথে অন্যতম সহায়ক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। তাই আমাদের সে আলোকিত পথে ফিরে যেতে হবে, যে পথের দিশা দিয়েছে ইসলাম এবং যে পথে চলে দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতে সফল হয়েছেন আমাদের পূর্ববর্তী মুসলিমরা।—শারয়ি সম্পাদক

সঙ্গে মিলে প্রতিষ্ঠা করেছেন রয়াল ডাচ শেল।

অ্যামেরিকান লোকটির নাম ওয়াল্টার সি. টিগল। তিনি স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানির প্রতিনিধি। মাত্র ৩১ বছর বয়সি জন ডি. রকফেলারের হাতে ওই প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করেছিল। ওটাই পরে হয় এক্সন। তেলের কূপ, পরিবহণ, পরিশোধন আর সরবরাহ—সব ছিল স্ট্যান্ডার্ড অয়েলের কব্জায়।

ব্রিটিশ ব্যক্তিটি ছিলেন সার জন ক্যাডমেন। অ্যাংলো-পারসিয়ান অয়েল কোম্পানির পরিচালক—পরে যেটার নাম হয় বিপি। উইন্সটন চার্চিলের উদ্যোগে ব্রিটিশ সরকার বিপি কোম্পানির এক শেয়ার কিনে নেয়। রয়াল নেভি জ্বালানির প্রয়োজনে কয়লা থেকে ছোটে তেলের দিকে। জাহাজ প্লেন আর ট্যাংকগুলোতে তখন জ্বালানির প্রচুর চাহিদা। তেল তখন 'প্রতিটি যুদ্ধের প্রাণভোমরা'।

অটোমোবাইল কোম্পানি তখন বাড়ছিল দ্রুত। ফোর্ড টি মডেলের গাড়ি বিকোচ্ছে লাখে লাখে। দুনিয়া তেলের পিয়াসী। কোম্পানিগুলোতে শুরু হয়েছে নির্মম প্রতিযোগিতা। বাজার অস্থিতিশীল।

অগাস্টের সেই রাতে ওই ৩জন ঠিক করল এই লড়াই বন্ধ হোক। দুনিয়ার তেল, তারা ঠিক করল, ভাগাভাগি করবে। তাদের দর্শন ছিল উৎপাদন এলাকা, পরিবহণ খরচ, বিক্রিমূল্য—সবকিছুতে তারা একমত হবেন। আর ভাগাভাগি করে নেবেন।

শুরু হলো এক বৃহৎ বাণিজ্য-জোট। তেলের কব্জা নিয়ে দুনিয়া শাসন তাদের লক্ষ্য। তাদের সাথে যোগ দিলো আরো ৪ প্রতিষ্ঠান। লোকে তাদের বলত সেভেন সিস্টার্স—দুনিয়ার সবচেয়ে বড় তেল কোম্পানি।

আল-জাজিরা ব্যাপক তথ্যসূত্র ঘেঁটে একটি তথ্যচিত্র বানিয়েছে। নাম দিয়েছে 'দা সিক্রেট অব দা সেভেন সিস্টার্স'। ওখানে ওরা দেখিয়েছিল, নিজেদের লোভ পূরণে কীভাবে ওরা সবাই এক হয়ে ঠিক করেছিল বাকি দুনিয়াকে রাখবে তেল বঞ্চিত। তবে মজার ব্যাপার হলো, ওদের এত বিক্রম থাকলেও সবসময় ওদের পরিকল্পনা কিন্তু ঠিকঠাক বাস্তবায়ন হয়নি; তবে ওরা অনেক সময় পেয়েছে সেগুলো ঠিক করতে।

এখন আমরা মুসলিমরা যদি ভাবি, ঠিক আছে, বন্ধ করব ওদের একচেটিয়া আধিপত্য—কিন্তু কীভাবে? এই ক্ষেত্রে ওরা এত লম্বা সময় ধরে আছে—আমরা ওদের থেকে আছি অনেক পিছিয়ে। ওদের অভিজ্ঞতায় ওরা প্রতিহত করে ফেলবে যেকোনো বাধা। এর অন্যতম কারণ, আমরা শুধু নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। সমাজে কীভাবে প্রভাব ফেলতে হয়, কীভাবে সমাজ বদলাতে হয়, আমরা সেদিকে নজর দিইনি মোটেও।

কিন্তু কোথাও না কোথাও থেকে শুরু তো করতে হবে। নিজেদের যত এই প্রবোধ দেবো, আমরা পারি না, পরিস্থিতি তখন আরো খারাপ হবে। যত তাড়াতাড়ি শুরু করব, পাল্লা দিতে তত দ্রুত সমৃদ্ধ হবে অভিজ্ঞতা।

☆☆☆

শিল্পোদ্যোগ তৈরি করে সম্পদ। দেয় আপনার জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের স্বাধীনতা। চাকরিতে আপনার লক্ষ্য থাকে কবে অবসরে যাব, তারপর এক এক করে পুরো করব জীবনের সব স্বপ্ন। অন্যের লক্ষ্য পূরণ করে, আর সংসারের নানা বিল শোধ করতে করতে শেষ হয় জীবন। কিন্তু শিল্পোদ্যোগী হলে কাঙ্ক্ষিত জীবনের পথচলা শুরু করা যায় তুলনামূলক আগে।

স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে এক সাক্ষাৎকারে অপরাহ উইনফ্রের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল তার সাফল্যের রহস্য নিয়ে। তিনি বলেছেন, 'নিজেকে জানতে হবে—এটাই আসল কথা। হুঁশিয়ার হতে হবে।

নিজেকে বোঝার ওপর মূলত নির্ভর করে আমাদের লক্ষ্যপূরণের সামর্থ্য। নিজের সাথে, অন্যের সাথে আর সর্বোপরি আমাদের স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্কটা হতে হবে মজবুত। এই পরিচয়গুলো যত নিখাদ হবে, আমাদের মাকসাদ তত ভালোভাবে বুঝব আমরা।

পরিহাসের বিষয়, এই বিষয়গুলো স্কুলে কখনো শেখানো হয় না। ইতিহাসের পুরোনো পাতা উল্টে আর পাঠ্যপুস্তকের ভারে আমাদের শেখায় কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝে চলার পাঠ। শেখায় কিছু সাধারণ নিয়মকানুন আর টিকে থাকার কৌশল। কোনোমতে জীবন ধারণের দীক্ষা গুলিয়ে খাওয়ানো হয় আমাদের। সামর্থ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে শেখায় না।

এখন কথা হচ্ছে, শিল্পোদ্যোগী হলে কীভাবে এই দিকগুলোতে আমরা ভালো করতে পারব?

প্রথমত, একজন উদ্যোক্তাকে জানতেই হয় নিজের শক্তি আর দুর্বলতার দিকগুলো। সত্যিকারের সফল উদ্যোক্তাকে শনাক্ত করতেই হয় নিজের প্যাশন আর দক্ষতা। শান দিতে হয় সেগুলোতে। কোন জিনিসটা তাদের থমকে রাখছে সেটার মূলোৎপাটন করতে হয় তাদের। এই যে নিজের শক্তির দিক আর ভুলগুলো জানার চেষ্টা, শক্তিগুলো আরো শানদার করার মেহনত আর দুর্বলতাগুলো কমজোর করার কসরত—এভাবেই দিনদিন এগিয়ে যায় মানুষ। চিনতে পারে নিজেকে। বুঝতে পারে তার জীবনের মহা উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত, অন্যের সাথে আমাদের সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে সমাজের পরিবর্তন। এর বদলে আমরা যদি টেবিলে বসে বসে কাজেই রয়ে যাই শুধু, অন্যদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা না করি, তাহলে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আমরা কখনোই আনতে পারব না। আধুনিক জীবনে মানুষ এমনিতেই অনেক বেশি আত্মকেন্দ্রিক। পাশের বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা হয় কালেভদ্রে। ঘরের লোকজনের সাথেই কথা হয় না ঠিকমতো। বাসে চড়ে অফিসে যে যাই পাশের লোকের সঙ্গে শুকনো হাসিও বিনিময় হয় না। সালাম-কালাম তো পরের কথা। ব্যস্ত সবাই যে-যার ধান্ধায়।

বিপরীতে শিল্পোদ্যোগে আপনাকে শুধু নিজের ভাবনা ভাবলেই হয় না; ভাবতে হয় অন্যের কথা—গ্রাহকের কথা, কর্মীর কথা, যারা ভেন্ডর-সাপ্লায়ার আছেন তাদের কথা। শিল্পোদ্যোগ আমাদের নজর টেনে নেয় বাইরে।

আর সবচেয়ে বড় কথা, ব্যবসায় এই যে ভবিষ্যৎ নিয়ে এক অনিশ্চয়তা, একটা সিদ্ধান্তের ফল কী হবে না-হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা—আমাদের স্রষ্টার সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক গড়ায়, এটা কিন্তু জরুরি। না হলে কী হয় দেখুন—চাকরিবাকরি আমাদের মধ্যে একধরনের নিরাপত্তা-বলয় তৈরি করে। আমাদের তখন শুধু নিজের চাকরি ধরে রাখা নিয়ে ভাবলেই হচ্ছে। অন্য কর্মী বা ওপরে যারা আছেন তাদের নিয়ে ভাবনাচিন্তার কোনো দরকার পড়ে না। চিন্তা শুধু মাসশেষে বেতন ঠিকঠাক পাওয়ায়। কিন্তু একজন উদ্যোক্তার জন্য বিষয়টা কিন্তু এত সাধারণ না। তিনি কোনো নিরাপত্তা-বলয়ে সুরক্ষিত নন। তাকে সবকিছুর বেলায় ভরসা রাখতে হয় এক উচ্চতর সত্তায়। ব্যবসার নানা সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাকে অনেকটা অন্ধবিশ্বাসে। এই আত্মবিশ্বাস এই

সাহস তার মাঝে আসে স্রষ্টার সঙ্গো মজবুত সম্বন্ধের কারণে। তার মাঝে যত অনিশ্চয়তা, যত অজানা। কিন্তু স্রষ্টার মাঝো তো এসব নেই; সব জানেন তিনি।

উদ্যোক্তা হিসেবে সমর্থনের জন্য আপনার চাই উচ্চতর কোনো সত্তা যিনি পথ দেখাবেন আপনাকে। আমাদের সেই সত্তা হলেন মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ।

☆☆☆

শিল্পোদ্যোগে কোনো সীমানা নেই। আপনি যদি ছোট ব্যবসা করতে চান, আপনার ব্যবসায় হয়তো মাত্র ১০ জন কর্মী—কোনো সমস্যা নেই। আবার আপনি এমন কোনো ব্যবসাও করতে পারেন, যা ছড়িয়ে পড়বে দুনিয়াজুড়ে। লোকে বলবে আপনি পারবেন না। কিন্তু তারা তো আর আপনাকে দমিয়ে রাখতে পারবে না। চাকরিতে আপনার ঊর্ধ্বতন আপনাকে ক্ষমতাবলে চাপিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু আপনি যখন উদ্যোক্তা তখন আপনার সৃজনশীলতাই আপনার ক্ষমতার সীমা।

গত কয়েক বছর ধরে কাজ করছেন এমন এক মশহুর ব্যবসায়-পরামর্শককে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'বিলিয়নিয়াররা কী করেন? আর বাকিরা কী করেন না বলে তারা মনে করেন?'

জবাবে সেই ব্যবসায়-পরামর্শক স্টিভ জবসের একটা কথা ধার করেছিলেন, 'এই দুনিয়া আর আপনার আশেপাশের সবকিছু যারা গড়েছেন তারা আপনার চেয়ে খুব বেশি আহামরি নন। এটা বুঝলে, আপনি দুনিয়া বদলাতে পারবেন। দুনিয়ার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন। আপনি নিজস্ব জিনিস তৈরি করতে পারবেন যেটা ব্যবহার করবে অন্যরা।'

তার এই কথার মানে কী? এর মানে দুনিয়াতে বিপ্লবী কিছু করার বিষয়টা শুধু মানুষের বুদ্ধিমত্তা বা পড়াশোনার ওপর নির্ভর করে না। আমাদের আগে যারা দুনিয়াতে এমন বিপ্লবী কিছু করেছেন, পার্থক্য শুধু, তারা ছিলেন নতুন কিছু করতে পাগলপারা। দিনের পর দিন লেগে থেকেছেন নিজের স্বপ্ন পূরণে। দিনমানের চাকরিতে কিন্তু সম্ভব না এরকম। চাকরিবাকরিতে আমরা শুধু দিন পার করি। মাসশেষে বেতন পেলেই খোশ। দুনিয়া বদলে দেওয়ার জন্য কিছুই করি না—অন্তত বেশিরভাগ চাকরিতে ব্যাপারটা এমনই।

সোনালি সময়ে যদি ফিরিয়ে নিতে চাই উম্মাহকে, আমাদের ব্যবসার বর্তমান ধারা বদলাতে হবে। গ্রাহক-কর্মীদের খুশি রাখায় আমাদেরই থাকতে হবে সবার আগে। দুনিয়া-পরিবর্তনে হতে হবে অগ্রপথিক। কিন্তু পরিবেশটা যদি ব্যবসাবান্ধব না করি, পরের প্রজন্মের জন্য উপযোগী না করি, তাহলে কিছুই হবে না।

রাখাল থেকে রাষ্ট্রপতি

[ব্যবসায়ীরা অল-রাউন্ডার]

> মানুষ ডায়পার বদলাবে, অভিযানের কৌশল আঁটবে, শুকর (মুসলিম হলে গরু-ছাগল) জবাই করবে, জাহাজ চালাতে পারবে, ভবনের নকশা করতে পারবে, সনেট লিখতে পারবে, হিসেবের খাতা লিখতে পারবে, দেওয়াল বানাতে পারবে, ভাঙা হাড় জোড়া লাগাতে পারবে, মুমূর্ষুকে সান্ত্বনা দিতে পারবে, আদেশ দিতে পারবে, সাহায্য করবে, একাই কাজ করবে, সমীকরণ মেলাবে, নতুন সমস্যা বিশ্লেষণ করবে, জমিতে সার দেবে, কম্পিউটার প্রোগ্রাম বানাবে, লড়ার মতো লড়বে, মরার মতো মরবে। কেবল একটি কাজে দক্ষতা অর্জন তো পোকাদের কাজ।
> —রবার্ট এ. হিনলিন

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে মেষ চড়াতে ধনী আরবেরা রাখালদের দায়িত্ব দিত। সারাদিন মেষ চড়িয়ে সবগুলোকে নিয়ে ফেরা ছিল তাদের কাজ। সবগুলোকে নিয়ে কেউ যদি ফিরতে না পারে, তার মানে পরের দিন আর তার চাকরি থাকবে না। ভালো রাখালদের এজন্য দামই ছিল আলাদা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ আগের সব নবিই রাখাল ছিলেন জীবনের কোনো এক পর্যায়ে।

রাখালদের নিজের ওপর নিজেকে নির্ভর করতে হয় প্রচণ্ড। খোলা ময়দানে সে তো একা। মেষ চড়ানোর কাজটাও সহজ না। মাঝে মাঝেই ওরা এদিক ওদিক চলে যায়।

পরিণত হয় নেকড়ের সহজ শিকারে। তাই যে ভালো মেষ চড়াতে পারে তার মানে নেতৃত্বগুণ আর ব্যবস্থাপনায় সে বেশ তুখোড়।

মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ যত আধ্যাত্মিক নির্দেশ দেন, তাতে বাস্তব জীবনে কাজে লাগানোর শিক্ষাও থাকে সমান হারে। যেমন : আমরা সালাত আদায় করি অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে। কিন্তু সেজন্য আগে শরীরটাও করতে হয় পাকপবিত্র—আমরা ওযু করি। ওযু যেন আধ্যাত্মিক নির্দেশ সালাতের বাস্তবিক জীবনের প্রতিবিম্ব। ভেড়ার পালের দেখাশোনা করে ঠিক যেমন হাতে-কলমে নবিরা পেয়েছেন মানুষদের নেতৃত্ব দেওয়ার সবক।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন, 'আল্লাহর পাঠানো সব নবিই ছাগল চড়িয়েছেন।'

তার সাহাবিরা শুধালেন, 'আপনিও?'

'হুম, আমিও। আমি কিছু কিরাতের (স্বর্ণমুদ্রার অংশের) বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ভেড়া চড়িয়েছি।'[১]

হাদিসটি থেকে জানলাম, মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহর পাঠানো সব নবি রাখালের কাজ করেছেন, এটার মাধ্যমে উপার্জনও করেছেন। সব নবিকে নবি হবার আগে 'তৈরি করা' হয়েছে রাখাল হিসেবে কাজ করিয়ে।

পেশা হিসেবে আজকালকার দিনে রাখালের কাজ বাস্তবে প্রায় অসম্ভব। এই সময়ে এর সবচেয়ে সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে আমার কাছে মনে হয় সশস্ত্র বাহিনীতে কাজ[২]—আর আছে এই শিল্পোদ্যোগ।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২২৬২; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২১৪৯; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ১১৬৪১; *শারহু মাআনিল আসার*, তাহাবি : ১২৫৭; দালায়িলুন নুবুওয়াহ, আবু নুআইম : ১১২।

[২] মুসলিম হিসেবে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীতে কাজ করার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক যে রাষ্ট্রব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বে চলমান তা সরাসরি আল্লাহর আইনের বিপরীত মতাদর্শের। শুধু বিপরীতই নয়; বরং ইসলামের বিভিন্ন বিধানকে এসব মানবরচিত মতবাদ শত্রু জ্ঞান করে। তাই সাধারণ অবস্থায় কোনো মুসলিমের জন্য জায়িয নয় যে, আল্লাহর আইনের সাথে সাংঘর্ষিক মতবাদের পক্ষে অস্ত্র তুলবে, সে মতবাদ ও তার কর্মীদের রক্ষার জন্য মুসলিমদের দিকে অস্ত্র তাক করবে এবং জালিমদের জুলুম টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করবে। এটা সম্পূর্ণরূপে নাজায়িয ও কুফর। অবশ্য ইসলামের

টিম লিডার, প্রজেক্ট ম্যানেজার বা কনসালটেন্ট হিসেবে বড় কোনো প্রতিষ্ঠানে কেউ চাকরি করতে পারেন। ভাবতে পারেন ওগুলো হয়তো কোনো বাস্তব বিকল্প। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এসব কাজে যতখানি আত্মনির্ভরতা আর উপায়-উপকরণ লাগে তা মোটেও একজন শিল্পোদ্যোক্তার ধারেকাছেও পৌঁছায় না। কারণ টিম লিডার বলুন আর প্রজেক্ট ম্যানেজার—সার্বিকভাবে একটা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন বা বিকাশে তাকেই মূল দায়িত্বের চাপ নিতে হয় না।

☆☆☆

ফ্রিল্যান্সিং কনসাল্টিং করবে বলে বেছে নিয়েছে ওয়াসিম। চাকরিতে তার বেতন ভালোই ছিল। কিন্তু তবু মনে হচ্ছিল কী যেন একটা নেই। গত ক'বছর কাজের সুবাদে অনেক সময় থাকতে হয়েছে পরিবার ছেড়ে। এদিকে তরতর করে বড় হচ্ছে তার একমাত্র মেয়ে। ওয়াসিমের মনে হচ্ছে সে তাকে সুন্দর শৈশব দিতে পারছে না।

ওয়াসিমকে প্রায় সময়ে কাজ করতে হতো কোম্পানির সদর দপ্তর গ্লাসগোতে। আর তাদের বাড়ি ছিল সাউথ ইংল্যান্ডে।

চাকরিতে পয়সাকড়ি ভালো হলেও ওয়াসিমের নিজেকে মনে হতো সে যেন মেশিনের এক দাঁত। মেশিনের এই দাঁত চলছে তো ভালোই—কিন্তু হাজার হোক, এক মেশিন তো।

নিজের জন্য কিছু করার ইরাদা করল ওয়াসিম। ওখানে সহকর্মীদের সাথে আজেবাজে আড্ডায় সময় নষ্ট হবে না। কাউকে পছন্দ না হলেও চোখেমুখে ভান ধরতে হবে না। কর্পোরেট জগতের চাকচিক্য একসময় তার জৌলুস হারিয়ে ফেলল ওয়াসিমের কাছে। নিজের পথ নিজেই বেছে নিল সে।

অবশ্য ফ্রিল্যান্স কাজটা খুব একটা সুবিধের হলো না। কর্পোরেট জগতে তার অভিজ্ঞতা কম না। তবে সেটা কেবল একদিকে। একটা পণ্য কীভাবে শুরু থেকে শেষ তক পৌঁছায়, বিক্রি হয় তার মাথামুণ্ডু কিছুই নেই তার নখদর্পণে। চাকরিতে

পক্ষে কাজ করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দিয়ে বিভিন্ন কলা-কৌশল শেখা ও শারীরিক দক্ষতা অর্জন করার যদিও অনুমতি আছে, কিন্তু এটা অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার। তাই সাধারণভাবে মাসআলা এটাই যে, কোনো মুসলিমের জন্য মানবরচিত মতবাদ রক্ষায় গঠিত কোনো সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দেওয়া বৈধ নয়। তবে বিশেষ উদ্দেশ্যে বা একান্ত প্রয়োজন হলে সেটা ভিন্ন কথা।—শারয়ি সম্পাদক

তো সেই কাজটি করত মার্ক নামের তার এক সহকর্মী। কাগজপত্র দেখভাল করত নিউ ইয়র্ক থেকে ডাস্টিন নামে তার আরেক সহকর্মী। ওয়াসিমের ডাক পড়ত যখন কোনো প্রজেক্ট শুরু হতো কেবল তখনই। নিজের কাজে সে মুনশি হলেও, কর্মজগতের অনেক কিছুই তার অজানা।

কোনো এক কাজে বিশেষজ্ঞ হবার এই এক বিপদ। কোনো খালি জায়গা থাকলে লেগোর গুটির মতো আপনি হয়তো ভরাট করতে পারবেন জায়গাটি। কিন্তু যখন একলা চলবেন, তখন পুরো লেগোর গুটি সাজানোরই দক্ষতা থাকতে হবে। হতে হবে মাস্টার বিল্ডার।

আজকের বেরহম অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শিল্পোদ্যোগকে মনে হতে পারে ভয়ংকর বিপজ্জনক আর জটিল। কিন্তু একই সাথে ওটা মুক্তি আর পরিতৃপ্তির। আর এখন চাকরির বাজারে যে অনিশ্চয়তা, আমি তো বলব ওটা জরুরিও।

দিনবদলের হাতিয়ার

[মুক্তি মিলবে স্বাধীন রোজগারে]

> সিলিকন ভ্যালি গড়েছিল ইঞ্জিনিয়াররা। তারা ব্যবসা শিখেছিল। আরো অনেক কিছু শিখেছে। তাদের মনে একটা বিশ্বাস খুব ছিল—একজন মানুষ যদি অন্যসব সৃজনশীল বুদ্ধিমান মানুষদের সাথে মিলে কাজ করে, মানুষের বেশিরভাগ সমস্যা কাটানো সম্ভব। আমিও কথাটা খুব করে বিশ্বাস করি।—স্টিভ জবস

'Know your Worth: If We Don't Know, We Can't Grow Our Community' নামে এক আর্টিকেল লিখেছিলেন নিকোল কেনি। প্রবন্ধটিতে তিনি বলেছেন, ইহুদিদের হাতে হাতে টাকাপয়সার লেনদেন হয় গড়ে মাসে ২০ দিন। আর সেই তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গাদের মধ্যে এই লেনদেন হয় মাত্র ৬ ঘণ্টা। ইহুদিদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বেশি। এগুলোতে ওদের ভালো আয়। ওদের অর্থনৈতিক শক্তি অনেক। আর্থিক উপকরণও প্রচুর।

শিল্পোদ্যোগে দিনবদল হয়। ইহুদিরা বাকিদের চেয়ে এটা অনেক আগে বুঝেছে।

ইহুদিদের বেশিরভাগ পরিবারে ব্যবসা শুরু করতে উৎসাহ দেওয়া হয়—শুনে অবাক হয়েছিলাম। এক সাক্ষাৎকারে নিউ ইয়র্কের এক ইহুদি উদ্যোক্তা বলেছিলেন, 'পারিবারিক অনুষ্ঠানে বড়রা সবসময় ব্যবসা নিয়ে কথা বলেন। কীভাবে তারা তাদের ব্যবসা বাড়াবেন সবসময় এই নিয়ে একজন আরেকজনের সঙ্গো মতবিনিময়

করেন। তর সইছিল না আমার—আমিও যে কবে স্কুল শেষ করে নিজের ব্যবসা শুরু করব! কলেজ শেষ করতেই এক চাকরি করলাম প্রায় ৬ মাস। যথেষ্ট হয়েছে। কাপড়চোপড় বেচে কীভাবে কামাতে হয় শিখলাম। এরপর একটার পর একটা ব্যবসা শুরু করলাম। আর পিছে ফিরে তাকাইনি।'

ইহুদি পরিবারে উদ্যোক্তা-মন অনায়াসে পাওয়া যায়। সিলিকন ভ্যালিতে এক স্টার্ট-আপের সহ-উদ্যোক্তা বলেছেন, 'যখন বড় হচ্ছিলাম, আমি আর আমার বাবা সবসময় ব্যবসা নিয়ে কথা বলতাম। তিনি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন সবসময় নিজের সেরা বুদ্ধিটা দিতে। বলেছেন, প্রতিদিন যত যা করি তাতে দিন দিন আরো ভালো করা মানে সফলতা। কলেজে পড়ার সময় হোস্টেলে থেকেই বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা করে করে দেখেছি। অবসর সময়ে, লেকচারের বিরতিতে সপ্তাহান্তে এগুলো চেষ্টা করেছি। বেশিরভাগ ছাত্ররা খণ্ডকালীন চাকরিতে ঢুকত। এর বদলে আমি চিন্তা করলাম ব্যবসার ধারণা খাটিয়ে কীভাবে টাকা কামানো যায়। বাবা শিখিয়েছিলেন সবচেয়ে জরুরি যে দক্ষতা আমাকে শিখতে হবে তা হলো মানুষ কী চায় সেটা বের করতে পারা। আমি প্রায় সময়ে বাবাকে ফোন করতাম। আমার পড়াশোনা আর ব্যবসার অগ্রগতির খবর তাকে জানাতাম। কলেজের দিনগুলোতে আমি অনেক কিছু শিখেছি। শুধু ক্লাসরুমে না; হোস্টেলেও।'

অন্ট্রাপ্রেনারশিপ : ক্রিটিকাল পার্স্পেক্টিভস অন বিজনেস অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বইতে লেখক নরিস এফ. ক্রুগারের একটা কথা বেশ নজর কাড়ে। তিনি লিখেছেন, '২ হাজার বছর ধরে ইহুদিরা শরণার্থী অবস্থায় ছিল। এ নিয়ে ওদের অনেক অনেক বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা আছে। এসব কারণে ওদের মধ্যে উদ্যোক্তা হবার ঝোঁক প্রত্যাশিত।'[১]

মুসলিম ঘরগুলোর আবহাওয়া কিন্তু এরকম না। অথচ আমাদেরও আছে দেশান্তরি হবার ইতিহাস। জোর করিয়ে শরণার্থী হবার ঘটনা।

আমাদের জেগে উঠতে হবে। বুঝতে হবে। তরুণ-যুবকদের মাঝে দিতে হবে উদ্যোক্তা হবার প্রাণশক্তি।

---

[১] খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ১০৬

আমার নিজের ঘরেও সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হতো পড়াশোনায়, ভালো একটা ডিগ্রি নেয়ায়। আমার বাবা-মা এই কাজে একদমই পিছপা হননি। নিজেদের সবটা উজাড় করে দিয়েছেন। আমার যা যা দরকার পড়াশোনার জন্য সবকিছুর আঞ্জাম দিয়েছেন তারা। কিন্তু প্রথাগত শিক্ষা এখন আর কাফি (যথেষ্ট) নয়।

☆☆☆

আমাদের এক পারিবারিক বন্ধুর ঘটনা বলি। তার বাবা যখন মারা যান, তিনি তখনো পড়াশোনা করছিলেন। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী। কিন্তু কখনো চাননি ছেলে ব্যবসায় নামুক। তার বাবা তাকে বলতেন, 'আমি তোমাকে কখনো ব্যবসায় দেখতে চাই না। তুমি মোড়ের কোনো দোকানে বসবে, এটা আমি দেখতে চাই না। আমি চাই তুমি এর থেকে অনেক অনেক দূরে থাকবে। তুমি ভালো করে পড়াশোনা করবে। ভালো একটা চাকরি নেবে। আমি তো ব্যবসায় এজন্যই এত খাটি যেন তোমার পড়াশোনা ঠিকঠাক চলে।'

আমার খুব দুঃখ লাগে—বেশিরভাগ মুসলিম বাবা-মায়ের চিন্তাই কেন যেন এমন। কোনো কোনো পরিবার যে অন্যরকম চিন্তা করে না তা না—দুনিয়া বদলে গেছে; আমাদেরও বদলাতে হবে।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ওপর আমার বিশ্বাস একদমই উঠে গেছে। তবে জানিব মিয়ান আমাকে বেশ সুন্দর একটা কথা বলেছেন, 'আমার বাবা ব্যবসায়ী ছিলেন। এজন্য আমার চিন্তাভাবনাটাও হয়েছে অমন। তবে এর সঙ্গে আমার শিক্ষাদীক্ষাও আমাকে সফল হবার অনেক রসদ দিয়েছে।'

মুসলিম পরিবারের ছেলেপেলেদের এরকম মন-মানসিকতা ব্যতিক্রম। মুসলিম পরিবারগুলোতে শিল্পোদ্যোগী হওয়ার উৎসাহ দিতে হবে প্রচুর পরিমাণে। কার্যকরী ক্যারিয়ার হিসেবে তারা যেন উদ্যোক্তা হওয়াকে বেছে নেয় এজন্য তাগিদ দিতে হবে তাদের।

☆☆☆

সম্পদহীন খালিস মুসলিমের চেয়ে সম্পদওয়ালা খালিস মুসলিমের সামর্থ্য থাকে বেশি। যে খালিস মুসলিম যত আত্মনির্ভর, নিজের মতো করে জ্ঞান অর্জন করতে

পারেন, তিনি তত বেশি সামর্থ্যবান। আর্থিক সম্পদ অনেক বড় অনুঘটক। অবশ্য অন্যান্য জিনিসেরও প্রয়োজন পড়ে একই সাথে।

কিছুদিন আগে শাইখ তাওফিক চৌধুরি তার এক লেকচারে বলেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় দিন দিন মুসলিম উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বাড়ছে। ওখানে মুসলিমদের সংখ্যা বড়জোর মোট জনসংখ্যার ৪ ভাগ। কিন্তু ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রায় ৩৭ ভাগই মুসলিম। বক্তৃতার একজায়গায় তিনি বাবা-মায়েদের বলেন, 'ডাক্তার অনেক হয়েছে। আমাদের মধ্যে এখন অনেক ডাক্তার। আর লাগবে না। আমাদের এখন দরকার ব্যবসায়ী।'

☆☆☆

সমাজের বাস্তব পরিবর্তন আনায় কাজ করে মূলত দু-ধরনের লোক: নীতি-নির্ধারণকারী আর নীতি-বাস্তবায়নকারী।

উদ্যোক্তারা হলেন নীতি-বাস্তবায়নকারী। বাস্তব পরিবর্তন—যে পরিবর্তন আপনি চোখে দেখেন; অবকাঠামো আর ব্যবস্থার পরিবর্তন, সেই পরিবর্তন আনতে বেশিরভাগ সময় তারাই নেন প্রথম পদক্ষেপ। যেকোনো বাস্তব পরিবর্তনই হয় অবকাঠামো উন্নয়ন করবে, নয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। দেশের আরো উন্নয়নের জন্য জরুরি উন্নত টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো, সম্পদ উন্নয়ন, উন্নত পরিবহণ-ব্যবস্থা ইত্যাদি। আর সেগুলোর জন্য চাই প্রাথমিক অবকাঠামো।

হাওয়ার্ড হিউজ না থাকলে আজ যেরকম একদেশ থেকে আরেকদেশ আমরা বিমানে করে পাড়ি দিই তা হয়তো সম্ভব হতো না। বিল গেইটস বা স্টিভ জবস না থাকলে আজ কোনো কম্পিউটার বা স্মার্টফোনের জন্ম হতো না। আমাদের আজও কাজ করে যেতে হতো মেইনফ্রেইম বা টাইপরাইটারে। আর কে জানে ইলন মাস্ক না হলে আরো কত বছর লেগে যেত বৈদ্যুতিক গাড়ির বাস্তব রূপায়ন দেখতে। মানবজাতিকে এগিয়ে নিতে বিশাল অবদান এসব উদ্যোক্তাদের। উদ্যোক্তারাই দুনিয়াকে এগিয়ে নেন, নাড়িয়ে দেন।

জি, হাতের কাজটা কর্মীরাই করেন। কিন্তু কোনো নেতা যদি এগিয়ে এসে দল ঠিক না করেন, একটা রূপরেখা না দেন, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে না নামেন, তাহলে কিন্তু এগুলো কিছুই হতো না। উদ্যোক্তারা তো নিছক ব্যবস্থাপক বা ম্যানেজার নন; তারা

মূল্যবোধ তৈরি করেন। তারা জানেন কী করে শূন্য থেকে কিছু বানাতে হয়। তারা জানেন কী করে বিশাল ঝুঁকির মাঝে ঝাঁপ দিতে হয়। সেদিক থেকে কর্মী আর ম্যানেজারদের ভূমিকা তুলনামূলক সীমিত। অনিশ্চিত আর অচেনা পরিস্থিতিতে আসা অনেক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারেন না তারা।

☆☆☆

কিছুদিন আগে একটা দাতব্য-সংস্থা আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা তার বক্তৃতায় দেখাচ্ছিলেন কীভাবে কত সময়ে সংস্থাটি এত কিছু অর্জন করেছে। উপস্থিত সবাই এই সাফল্যে সত্যি অবাক। প্রতিষ্ঠাতা পরে তার কাজকর্মের ইতিহাস জানান। একসময় তিনি ছিলেন একজন সফল উদ্যোক্তা। দাতব্য সংস্থার সব পরিকল্পনা আর সেগুলোর বাস্তবায়নে তিনি তার বাণিজ্যিক মনোভাব খাটিয়েছেন বলে জানান। আর এজন্যই এত কম সময়ে এত অর্জন।

ব্যাবসায়িক মনোভাবের কারণে হওয়া এই অর্জন শুনে আমি অবাক হইনি একটুও। তবে অনেকেরই যে এতে চোখ কপালে উঠেছিল আমি নিশ্চিত।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখেছি, দাতব্য সংস্থায় লোকজন ব্যাবসায়িক মনোভাব নিয়ে আগাতে চান না। কিছুটা বুঝিও, কেন তারা এমনটা করছেন। ব্যাবসায়িক মনোভাব মানেই তো ব্যয় কমানোর চিন্তা আর আমলাতন্ত্রের চর্চা। তবে এর কিন্তু সুফল অনেক।

একজন উদ্যোক্তা তার ব্যবসায় যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তা কাজে লাগাতে পারেন সবখানে। কিন্তু তারপরও আমরা এর চর্চা করি না।

স্কুলে আমাদের কত কী শেখায়। কিন্তু কখনো নিজে নিজে জ্ঞান অর্জন করতে শেখায় না। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় সূক্ষ্ম চিন্তার জায়গা নেই তেমন একটা। কম উন্নত দেশগুলোতে এই সমস্যা অনেক প্রকট। উন্নত দেশগুলোও যে এগুলো থেকে একেবারে মুক্ত তা-ও কিন্তু নয়।

কী কী কারণে কোনো কোনো দেশ দ্রুত অন্যদের চেয়ে এগিয়ে যায় তা নিয়ে এক বিস্তারিত গবেষণা হয়েছিল। গবেষণায় দেখা গেছে, এর অন্যতম কারণ এসব দেশ শিল্পোদ্যোগে উৎসাহ দেয়, ব্যবসা-বাণিজ্যকে সহজ করে। গবেষকরা দেখেছেন,

এসব দেশের লোকজন বহু বিষয়ে দক্ষ। কেবল বিশেষজ্ঞদের চেয়ে বহুদর্শী লোকেরা ভালো পরিবর্তন আনতে পারেন।

আমাদের গৎবাঁধা সামাজিক চিন্তা আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে বলে না; বলে না বিভিন্ন কাজে দক্ষতা বাড়াতে। কিন্তু যারা উদ্যোগী, উদ্যোক্তা হবার কারণে আপনা-আপনিই বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান বাড়ে; বাড়ে দক্ষতা।

পরিবর্তন আনতে আমাদের হতে হবে বহুদর্শী। দিনবদলের জন্য এটা চাই-ই চাই। আর শিল্পোদ্যোগ সহজ করে একে।

আমার আফসোস হয়, কেন আরো বেশি বেশি খাঁটি মুসলিম শিল্পোদ্যোক্তা নেই। কারণ উদ্যোক্তা হবার বিষয়টি যে আসলেই বোঝে, সে-ই বোঝে এর আসল হিকমাহ। এটা চোখে দেখার বিষয় না। অন্যের থেকেও নেওয়া যায় না। আর আমার মতে যতক্ষণ না আপনি ব্যবসায় পুরো ঝাঁপ দিচ্ছেন, ততক্ষণ এই হিকমাহ থেকে সত্যি সত্যি ফায়দা পাওয়াও অসম্ভব।

ব্যবসা নিয়ে যত নেতিবাচক চিন্তা

[হোঁচট যেখানে সাফল্যের সোপান]

> উদ্যোক্তা হওয়া ঝুঁকির বিষয় মনে হলে অন্যের হয়ে ৪০ বছর ধরে চাকরি করে আর সামাজিক নিরাপত্তায় ভরসা রেখে দেখুন।—স্টিভ মের

ব্যবসা শুরু করা অনেকের কাছে শেষ ভরসার মতো। আপনি যদি ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার কিছু না হতে পারেন কিংবা অন্য কোনো ভালো চাকরি জোটাতে না পারেন, কেবল তখনই ব্যবসার চিন্তা করে দেখতে পারেন।

উপনিবেশিত দেশগুলোতে এই সমস্যাটা শুরু হয়েছে আসলে চিরাচরিত ধ্যানধারণার কারণে। আমাদের আগের প্রজন্মের লোকেরা নিজ দেশ ছেড়ে অনেকে পশ্চিমা দেশগুলোতে এসেছিলেন। তাদের শিক্ষাদীক্ষা অত বেশি ছিল না। ভালো চাকরি জোটাতে পারতেন না। ওদিকে এখানে এসে যে পানশালায় যাবেন কিংবা শ্বেতাঙ্গদের সাথে মিশে আড্ডা দেবেন, ছিল না সেই সুযোগটাও। এরকম আলাদা থাকার কারণে পয়সা রোজগারে তাদের একমাত্র অবলম্বন হতো 'ব্যবসা'। তারা মোড়ে কোনো দোকান দিতেন। সেসব দোকানে কাজ করতেন নিজেরা নিজেরাই। আবার দেখা যেত এসব দোকানের বেশিরভাগ ক্রেতাও ভারতবর্ষের লোকজন। এরকম করে করে তাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে এক জাতিগত হীনম্মন্যতা। নিজেদের তারা ভাবতেন 'বাইরের'। শ্বেতাঙ্গ সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পেতে তাদের চোখে ভালো চাকরির চেয়ে উপযুক্ত আর কী মনে হবে? ডাক্তার আর ব্যারিস্টার বাদে আর

কী আছে সেজন্য?

ভারতবর্ষে উপনিবেশের পরও অনেক বাবা-মায়ের ধ্যানধারণা এমনই। সেখানে সন্তান ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে মানে সমাজের চোখে সবচেয়ে উপযুক্ত কাজ পেয়েছে।

যেসব বাবা-মা এসব চিন্তায় আচ্ছন্ন হননি, তারাও যে ভিন্ন চিন্তা করেন, তা-ও কিন্তু না। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হলে নিশ্চিত ইনকাম। কিন্তু সবার বেলায় মোটেও একথা সত্যি নয়। আর তা ছাড়া এসবের বাইরেও আরো অনেক চাকরি আছে যেগুলোতে বেতন খুব ভালো।

আমাদের বাবা-মায়েদের এই চিন্তা নতুন প্রজন্মের ওপর চাপিয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত বোঝা। জীবন নিয়ে তারা অসন্তুষ্ট। অল্প বয়সে ঋণের বোঝায় জর্জরিত। অনেকে এমন সব চাকরি করছে, যা তারা একান্ত বাধ্য না হলে করতই না। এসব চাকরিতে তারা কোনো পরিতৃপ্তি খুঁজে পায় না।

২০০৮ সালে যে অর্থনৈতিক মন্দা হলো, সেখানে কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেছে, আজীবন চাকরি টিকে থাকবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।

ব্যবসা শুরু করার চিন্তাকে কখনো আমল দেওয়া হয়নি। অথচ আজকে এটা যে কত জরুরি তা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। কেন জরুরি সেটা বুঝতে চলুন 'ব্যবসায়ী' হবার আসল মানেটা বুঝি আগে।

ন্যাটালি সিশন, যার আরেক নাম স্যুটকেস অন্ট্রাপ্রনার—ব্যবসার সত্যিকার সম্ভাবনা নিয়ে বলেছেন, 'উদ্যোক্তা মানে দিনবদলের হাতিয়ার। আন্দোলনের অনুঘটক।'

আমার কাছে উদ্যোক্তা মানে নিজের দক্ষতা আর সামর্থ্য বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করে সমাজে অর্থবহ পরিবর্তন আনা। সঙ্গে নিজের কামাই-রোজগার। আমার কাছে এটাই ব্যবসা।

ব্যবসা শুরু করা আজ যত সহজ, আগে কখনো এমন ছিল না। আজ শুধু একটা কম্পিউটার আর ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে যেকোনো জায়গা থেকে ব্যবসা শুরু করা যায়। উদ্যোক্তা হবার সবচেয়ে সুন্দর দিক হচ্ছে—আপনার যা পছন্দ, যে কাজটি আপনি সবচেয়ে ভালো পারেন, আপনি সেটাই করতে পারবেন। সাথে

ওটাতেই সমাধান করতে পারবেন মানুষের সাধারণ সমস্যাগুলো। আপনি আপনার মনমতো ইনকাম করতে পারবেন। আপনার সময় আর টাকাপয়সা নিয়ে আপনি হবেন স্বাধীন।

দুনিয়াকে জুলুমমুক্ত করার চমৎকার হাতিয়ার ব্যবসা। মুসলিমদের তো আজ এটাই দরকার সবচেয়ে বেশি। কত জায়গায় আজ মুসলিমরা জুলুমের বলি। নেই ন্যূনতম অধিকার। একই সময়ে কত দিকে লড়তে হচ্ছে আমাদের। আর্থিক দারিদ্র্য তো আছেই মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো। আর সার্বিকভাবে ইসলাম তো এটাই চায় আমাদের কাছে—আমরা হব দুনিয়া থেকে জুলুম দূর করার অগ্রসৈনিক।

উবারের ঘটনা দিয়ে বোঝাই বিষয়টা।

উবার আসার আগে ক্যালিফোর্নিয়ার ট্যাক্সি ড্রাইভারেরা ছিলেন বেকায়দায়। ট্যাক্সিতে কত রকমের মানুষ ওঠে। ভালো লোক যেমন থাকে, মাতালও থাকে—বমিটমি করে একাকার। আবার গুন্ডা-বদমাশও যাত্রী হয়ে উঠে লুট করতে পারে আপনাকে। কিন্তু ট্যাক্সি থেকে এরা নামামাত্র এদের ধরার আর কোনো উপায় নেই।

এত ঝুঁকি নিয়ে একটা কাজ করছেন, উলটো আপনাকেই বিল দিতে হবে ট্যাক্সি কোম্পানিকে। কই, অন্যান্য চাকরিতে তো এমন হয় না। আপনি কি প্রতিদিন অফিসে গিয়ে আপনার বসকে টাকা দেন?

কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার ট্যাক্সি ড্রাইভারদের জন্য বিষয়টা এমন বিভীষিকাই ছিল। কারণ ট্যাক্সি চালাতে তাদের গাড়িতে লাগাতে হতো একটি অনুমোদিত মেডালিয়ান বা ব্যাজ। ওটা ইস্যু করত সরকার। ওটা না থাকলে আপনি গাড়ি ভাড়া দিতে পারবেন না। ট্যাক্সি কোম্পানিতে দিতে পারবেন না। এই ব্যাজগুলো থাকত ট্যাক্সি কোম্পানির হাতে। চড়া দামে বিক্রি করত ওগুলো, কারণ গোটা অ্যামেরিকায় ওগুলোর সংখ্যা সীমিত। ওগুলো ছাড়া আপনার ট্যাক্সি চালানো যাবে না।

এদিকে ওগুলোর সংখ্যা সীমিত বলে হাজার হাজার ডলার ছিল ওগুলোর দাম। অনেক সময় সরাসরি পাওয়াও যেত না। অন্যের হাত থেকে নিতে হতো। বছরের পর বছর গেলেও অ্যামেরিকার অঙ্গরাষ্ট্রগুলোতে এই সীমিত ব্যাজের সংখ্যা আর বাড়ানো হয়নি। যে কারণে দরকারি সময়ে অ্যামেরিকার রাস্তায় ট্যাক্সি পাওয়া ছিল ভীষণ সৌভাগ্যের ব্যাপার।

ক্যালিফোর্নিয়া সরকারের মেডালিয়ান 'আইন' নাগরিকের জন্য হলো জুলুম। দরকারের সময় পাওয়া যায় না। কোনো প্রেগনেন্ট নারী হাসপাতালে যাবেন কিংবা জরুরি মিটিং ধরতে হবে, অথচ রাস্তায় কোনো ট্যাক্সি নেই।

উবার এসে পাল্টে দিলো সব। একজন উদ্যোক্তা বদলে দিলো সমাজের চিত্র। দুনিয়াজুড়ে সবচেয়ে দ্রুত বেড়ে ওঠা পরিবহণ-সেবায় পরিণত হলো উবার। এর বাজারমূল্য এখন ১৮ বিলিয়ন ডলারের ওপরে। অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসের মতো লোকজন এখন সেখানে বিনিয়োগ করেন।

উবার কোম্পানি হিসেবে নিজে অর্থ কামাচ্ছে। এর সেবা নিয়ে অর্থ রোজগার করছেন চালকেরা। সাথে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে ট্যাক্সিসংক্রান্ত বিধিমালাকে—অ্যামেরিকাতে নয় শুধু, সারা দুনিয়ায়। যারা সমাজের প্রচলিত নিয়ম ধরে রাখতে চেয়েছিল উবার খুলে দিয়েছে তাদের স্বেচ্ছাচারিতার মুখোশ। এরই নাম প্রথাবিরোধী। এরই নাম ইতিবাচক পরিবর্তনের মহাসড়কে পথচলা। ব্যবসার আসল মাহাত্ম্য একবার বুঝতে পারলে এমন চূড়ায় ওঠা অসম্ভব কিছু নয়।

শুধু উবার কেন, নতুন ধরনের চিন্তা নিয়ে যারা আসেন, নিজের অজান্তে তারা অনেক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখেন।

২০০৯ সালে ইরানের রাজনৈতিক অস্থিরতায় আর ২০১১ সালে আরব বসন্তে টুইটার যে মূল ভূমিকা রাখবে তা কি ভেবেছিলেন এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক ডরসি?

হয়তো মনে হচ্ছে, প্রযুক্তিজগৎ ছাড়া নতুন দুনিয়ার উদ্যোক্তা হওয়া বুঝি অসম্ভব। কিন্তু আসলে তা নয়। প্রযুক্তি কেবল একটি মাধ্যম। তবে বর্তমান সময়ে অনেক শক্তিশালী মাধ্যম। উদ্যোক্তা হয়ে দুনিয়া পরিবর্তনের জন্য জরুরি আসলে উদ্যোক্তার নীতিনৈতিকতা, তার দিনবদলের চিন্তা।

নীতিনৈতিকতার বিষয়টি কেন জরুরি তা বুঝতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চেয়ে ভালো নজির আর কী আছে!

১৭ শতকে ওয়েস্টমিনিস্টারের লর্ডরা চাইল ইন্ডিয়ায় ব্যবসা করবে। তাই বড় বড় জাহাজ বানাল তারা। সেগুলোতে করে রপ্তানি করল তুলা আর চায়ের মতো পণ্য।

ধীরে ধীরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জায়গা করে নিল। শ্রমিক আর কর্মীদের তারা বেতন দিত স্থানীয় মালিকদের চেয়ে বেশি। স্থানীয় অসচ্ছল দক্ষ প্রতিভাবান লোকেরা তাই সহজে আকৃষ্ট হতো ওদের সঙ্গে কাজ করতে। একসময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এত বড় হলো যে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। রাজনৈতিক অঙ্গনে আসন গেড়ে শুরু করল উপনিবেশি আধিপত্য। এরপর বাকিটা তো ইতিহাস।

আজও কি এটা বদলেছে?

এখনো খেয়াল করে দেখুন কারা কর্মীদের বেতন বেশি দেয়। সুযোগ-সুবিধা বেশি দেয়। আর কারা এসবে কম কম দেয়। জুলুমবাজ কর্পোরেশনগুলো কর্মীদের বেতন দেয় বেশি, সুযোগ-সুবিধাও। অন্যদিকে মুসলিম কোম্পানিগুলো যত কমে কাজ করাতে পারে, বাঁচে। তারা বুঝতে চায় না মন-মানসিকতা একটু বদলালে কত বিশাল পার্থক্য তৈরি হতো।

ভুল হাতে পড়লে ধারালো অস্ত্র যেমন খারাপ, ব্যবসাও তেমন। শিল্পোদ্যোগের সম্ভাব্য ক্ষমতার কারণেই আরো বেশি বেশি ভালো লোক এখানে চাই খারাপ লোকদের বদলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বেশিরভাগ সময় শিল্পোদ্যোগগুলোর জন্ম হয় লোভ থেকে। তাতে আগের জুলুম তো কাটেই না, বরং আরো বাড়ে বা আসে নতুন মুখোশে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই তেল-বাণিজ্যের করাতে পশ্চিম কীভাবে ফালা ফালা করেছে মধ্যপ্রাচ্যকে। আজও তারা থেমে নেই। এই তো কখনো লাগিয়ে দিচ্ছে গৃহযুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, কখনো বা সরাসরি যুদ্ধ।

মিডিয়াতেও ব্যবসায়ী হবার বিষয়টি সুনজরে দেখানো হয় না। ওখানে ব্যবসায়ী হবার দুটো প্রান্তীয় দিক দেখায়। হয় দেখায় কোনো নতুন উদ্যোক্তা কী করে ধুঁকে ধুঁকে টিকে আছে। আর নয়তো দেখায় কী করে কোনো ব্যবসায়ী নিজের লোভ পূরণে ব্যবসাকে হাতিয়ার করেছে। প্রচারমাধ্যমের চোখে চাকরির চেয়ে ব্যবসা অনেক অনেক কঠিন। মানুষ বিত্তশালী হতে পারবে—হয় কোনো জাদুর কাঠির ছোঁয়া পেয়ে, নয়তো বেআইনি কিছু করে!

ব্যবসার ক্ষমতা সাহাবিদের চেয়ে ভালো বুঝেছিলেন আর কোনো মুসলিমেরা? আবু বকর, উমার, উসমান, আবদুর রহমান ইবনু আউফ আর তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ

রাযিয়াল্লাহু আনহুমের মতো কত সাহাবি ব্যবসা করেছেন। ব্যবসার আয় দিয়ে চলেছেন নিজেরা। পয়সা কাজে লাগিয়েছেন জিহাদে আর ইসলামের প্রসারে। অর্থ ব্যয় করেছেন মানুষের মঙ্গলে।

সাহাবিদের পরের প্রজন্মের মুসলিমরাও ব্যবসা থেকে পিছিয়ে ছিলেন না। মূলত ব্যবসার কারণেই চারিদিকে ইসলামের প্রচার-প্রসার হয়েছিল এত দ্রুত। আফ্রিকার উত্তরে আর পূর্বে, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, এমনকি অত যে দূরে চীনের পূর্বপ্রান্ত, সেখানেও ইসলামের চাঁদ উঠেছে ব্যবসার আকাশ বেয়ে।

☆☆☆

ছোট ব্যবসাকে অনেকে 'ছোট' করে দেখেন। অনেকে মনে করেন শুধু বড় বড় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলোই বুঝি বেশি বেশি চাকরির সুযোগ করে দিচ্ছে। অন্তত এটুকু তো তারা ভাবেনই, উন্নয়নশীল দেশে প্রায় ৯০ ভাগ চাকরির সুযোগ দিচ্ছে বড় কোম্পানিগুলো। বেশিরভাগ মানুষ মনে করেন দেশের অর্থনীতির চাকা ঘোরাচ্ছে বড় বড় ফার্মগুলো। কিন্তু আসলে দেশের অর্থনীতির ইঞ্জিন হচ্ছে ছোট ছোট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলো।

যুক্তরাজ্যে ছোট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান আছে আড়াই লাখেরও বেশি। বছরে এরা অনেক পরিমাণ ট্যাক্স দেয়। চাকরির সুযোগ করে দেয় অনেক। চাকরির সুযোগ যদিও অর্থনীতির ভালো-মন্দের সবচেয়ে নিখাদ মাপকাঠি নয়। তবু আলাপের খাতিরে বলতে পারি, বড় বড় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ছোট ব্যবসাগুলো থেকে কর আসে বেশি। চাকরির সুযোগও দেয় এরা সবচেয়ে বেশি।

ওয়েলথ অভ নেশনস বইতে অ্যাডাম স্মিথ চমৎকার বলেছেন, যে দেশ ব্যবসায় উৎসাহ দেয় সে দেশের অর্থনীতি আগায় দ্রুত। ইজরাইল বা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে বিষয়টা। এখনকার সরকার ব্যবসার জন্য সুন্দর পরিবেশ করে রেখেছে বলেই এখানকার অর্থনীতির চাকা ঘুরছে খুব দ্রুত। আপনি আইফোন বলেন, গুগল ম্যাপ বলেন কিংবা ইন্টারনেট বা তুলাশিল্পে রোবটের ব্যবহার—শুরুতে এগুলো নিয়ে হয় সরকারি অর্থায়নে গবেষণা হয়েছে, নয় সামরিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শুরু হয়েছিল। পরে ব্যবসায়ীদের হাতে দেওয়া হয়েছে যেন ছড়িয়ে পড়ে গণমানুষের কাছে।

ব্যবসাই হচ্ছে অর্থনীতির চাকা। কিন্তু বেশিরভাগ মুসলিম পরিবারে এই ব্যবসাকেই দেখা হয় খাটো করে।

☆☆☆

আফতাব কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েনি। কোনো চাকরি করেনি কোনোদিন। সে এখন তার তৃতীয় ব্যবসা শুরু করেছে। মেয়োনিজের ছোট ছোট প্যাকেট বেচে।

প্রথম বছরে তার কোম্পানির আয় হয়েছে ১০ লাখ ডলারের কিছু ওপরে। এই সময়ে সে মূলত কাজ করেছে ব্যবসার উন্নয়নে আর পরিবেশকদের সাথে চুক্তিতে। অবশ্য ব্যবসায় তো এগুলোই শুধু কাজ নয়, আরো অনেক কাজ আছে। উৎপাদন আর প্রচারণা খরচ কমানো জরুরি ছিল আফতাবের জন্য। কিন্তু সে ঠিক করেছিল ওটা দ্বিতীয় বছরে ধরবে। সে ধারণা করেছিল পরের বছর বিক্রয় আর বিপণনের মতো মূল কাজ নিয়ে হয়তো এত চিন্তা করতে হবে না। দীর্ঘমেয়াদি এমন চিন্তার কারণে প্রথম বছর ব্যবসার আয়-ব্যয় সমান-সমান হয়েছিল শুধু। এখনো আরো অনেক লাভ বাকি—এমনটাই ছিল তার ভাবনা।

স্থানীয় মুসলিমদের মধ্যে বেশ ভালো পরিচিতি ছিল আফতাবের। সে তার পরিচিত লোকজনদের সাথে নিজের ব্যবসার সফলতা নিয়ে কথাবার্তা বলত। তার ইচ্ছা ছিল অন্যদের সে সাহায্য করবে। ঠিক করল অন্যদেরও ব্যবসায় আসতে কোর্স চালু করবে। অনলাইনে ও অফলাইনে বেশকিছু ইসলামি গ্রুপে আফতাব প্রচারণা চালাল। কিন্তু সমস্যা বাধল অন্যখানে।

আফতাবের পরিচিত লোকজনদের অনেকে ছিলেন অনলাইন সেলিব্রেটি। তাদের অনেক ফলোয়ার। ধর্মচর্চা আর প্রচারে তাদের আলাদা সুনাম। স্থানীয় মুসলিম সমাজের পরিচিত মুখ। তারা আফতাবের সততার দিকে আঙুল তুললেন। তারা জানতে চাইলেন প্রথম বছরে আফতাব কী রকম লাভ করেছে। সে জানাল আয়-ব্যয় সমান। ওখান থেকে শুরু হলো সমস্যা।

সেলিব্রেটি ভাইয়েরা—যারা প্রায় সময়ে বিভিন্ন লেকচারে একসাথে যান, বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ করেন, দাতব্য কাজে অংশ নেন—স্থানীয় মুসলিমদের সাবধান করতে লাগলেন। ছড়াতে লাগলেন আফতাব 'নকল ব্যবসায়ী'। অন্যের টাকা নিজের পকেটে পোরার ধান্ধা করছে।

শুধু এই করেই থামেননি তারা। অনেক মজলিশে তারা আফতাবের সেলস কপি নকল করে ঠাট্টা করতে লাগলেন। আর লোকজনদের উপদেশ দিতে লাগলেন ব্যবসা না করে চাকরি ধরতে।

সেলিব্রেটি ভাইদের এমন কাজে উদ্যম হারিয়ে ফেলেছিল আফতাব। নতুন ব্যবসায়ী সৃষ্টির স্বপ্ন তার স্বপ্নই রয়ে গেল। তবে মজার ব্যাপার হলো একটা।

তাকে নিয়ে মজা করছিল এমন এক ভাই চাকরি হারিয়ে বেকার বসে থাকলেন টানা কয়েক মাস। আর ওদিকে দ্বিতীয় বছরে বেশ ভালো লাভের মুখ দেখল আফতাবের উদ্যোগ।

শুরুতেই ব্যবসায় ভালো লাভ না হলে কাউকে নিয়ে এমন হাসি-তামাশা করা মুসলিম সমাজের নিত্য চিত্র। 'ভালো চাকরি' তাদের চোখে পরম আরাধ্য। আর্থিক মুক্তির নিশ্চয়তা। অথচ এটা যে কী বিশাল ধোঁকা! চাকরির নিরাপত্তা মায়া ছাড়া আর কী? আর আয়-রোজগারের সীমাবদ্ধতা তো আছেই।

প্রথম দিন বাইক চালাতে গিয়ে পড়ে গেলে কি আমরা এভাবে হাসিঠাট্টা করব? অথচ নতুন উদ্যোক্তারা রাতারাতি কেউ সফল না হলে তার বেলায় আমরা তা-ই করি। প্রথম বাইক চালাতে গিয়ে পড়ে গেলে কি তাকে বলি, তোকে দিয়ে বাইক চালানো হবে না। যা হেঁটে হেঁটে যা। নাকি আঙুল তুলে বলি, কত সাহস—বাইক চালাবে! কিন্তু ব্যবসার বেলায় সব অ-ব্যবসায়ী নিজেকে ভাবেন পণ্ডিত। প্রতিবার একই ভাঙা রেকর্ড বাজান—চাকরিই সম্মানজনক, চাকরিই বুদ্ধিমানের কাজ।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর চোয়াল-বাঁধা প্রতিজ্ঞা ছেড়ে দেওয়াই কি মুমিনদের কাজ? ঝুঁকিহীন দুধভাত জীবনের চিন্তা কবে থেকে ঢুকল আমাদের মগজে? ভীরু মন আর অতিরিক্ত হুঁশিয়ারি কবে থেকে হলো সম্মানের প্রতীক?

সমাজ আজ সফলতার যে সংজ্ঞা বেঁধে দিয়েছে, কোনো ব্যবসা যতক্ষণ না সেখানে পৌঁছাচ্ছে, ততক্ষণ যেন সেটা একদম ব্যর্থ! সমাজের সংজ্ঞায় সফল মানে দুনিয়াজোড়া খ্যাতি, আর ব্যাংকে লাখ লাখ টাকা। ওরকম না হলে 'নিশ্চিত' চাকরি নেওয়াই সমাজের চোখে উত্তম, বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু পরিহাসের বিষয়, একজন ব্যর্থ উদ্যোক্তা কিন্তু সফল ব্যবসায়ীর চেয়ে খুব বেশি দূরে না। অন্তত চাকরিজীবীদের চেয়ে তো অনেক কাছে। কিন্তু লজ্জার বিষয়

সমাজের চোখে সফল হতে না পারার দুশ্চিন্তাই বহু নব্য উদ্যোক্তাদের দমিয়ে রাখে। তাদের স্বপ্ন দেখার সাহসকে সমাজ কুচি কুচি করে কেটে তামাশা করে। চার হাত-পা দিয়ে চেপে ধরে। স্বাপ্নিক লোকেরা তখন বাইকে চড়া শিখবে কী, উঠে দাঁড়াতেই চোদ্দবার ভাবে।

সবচেয়ে বড় কথা, শেখা মানেই তো ব্যর্থতা থেকে উঠে দাঁড়ানো। যারা মুসলিম যারা তাকদিরে বিশ্বাস করে, ব্যর্থতা তো তাদের কাছে ভবিষ্যৎ সাফল্যের মই। ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের এক ভদ্রলোক চমৎকার বলেছেন, ‘একজন ব্যবসায়ী মুসলিম কখনো সাফল্য কিংবা ব্যর্থতাকে টাকা দিয়ে মাপে না।’

একজন মুসলিমের পুরো বিশ্বাস আল্লাহর ওপর। তাকদিরে যা লেখা আছে তা হবেই। যা লেখা নেই তা কখনো হবে না। মুসলিম ব্যবসায়ীর মাঝে থাকে তীব্র ক্ষুধা, উদ্দীপনা, লেগে থাকার ইরাদা, ইতিবাচক মানসিকতা। ব্যবসায় এগুলোই তাকে নিয়ে যায় অবিশ্বাস্য সাফল্যের দিকে। আর একটায় যদি সফলতা না আসে, আরেকটায় যাবে। সাফল্য আর ব্যর্থতা দুটোই বরাবর তার কাছে।

মনে পড়ে ক্যামব্রিজের সেই দিনগুলো

[সুযোগ ছড়িয়ে থাকে সবখানে]

> যখন বন্ধ হয়ে যায় এক দরজা, খুলে যায় আরেক দরজা। কিন্তু ওই বন্ধ দরজার দিকে আমরা এত বেশি সময় চেয়ে থাকি, হা-হুতাশ করি, পাশের খোলা দরজাটি আর চোখে পড়ে না।—হেলেন কেলার

আমার ভার্সিটির পড়াশোনা শেষের দিকে তখন। মিস্টার হ্যারিম্যানের ইনফরমেইশন সিস্টেম ক্লাসে বসে আছি। ইন্টার্নশিপের ঘোষণা দিলেন প্রফেসর। মনের মধ্যে আমার একই সাথে উত্তেজনা ও আতঙ্ক। একদিকে বাস্তব দুনিয়ায় নেমে নিজের পড়াশোনা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আয়-রোজগারের সুযোগ। আরেক দিকে আপন আলয় ছেড়ে যাবার সীমাহীন ভয়। বাবা-মাকে ছেড়ে এই বয়সেই এত দূরে যেতে চাচ্ছিলাম না আমি।

লেকচার শেষে মিস্টার হ্যারিম্যানকে জানালাম নিজের শহর শেফিল্ডে আমি কোনো কাজ পাব কি না। প্রফেসর বললেন, পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেটা নির্ভর করবে আমার আবেদনপত্রটি কত ভালো, এখানে ইন্টার্নশিপের কেমন সুযোগ আর আমার ইন্টারভিউয়ের ওপর। তবে অ্যাপ্লিকেশনে কোনোভাবেই লেখা যাবে না যে, আমি বিশেষ কোনো এলাকায় কাজ করতে চাই। হয় বলতে হবে আমি যুক্তরাজ্যের যেকোনো জায়গায় ইন্টার্নশিপ করতে রাজি। আর নয়তো বাদ দিতে হবে পুরো একটি বছর।

মনে মনে ভাবলাম, শেফিল্ডে কি কাজের এমনই আকাল? একটা না একটা তো পাওয়া যাবে নিশ্চয়।

অক্টোবরের শেষে বিভিন্ন জায়গায় ইন্টার্নশিপের আবেদন পাঠালাম। বেশ কিছুদিন গেল। কোথাও থেকে কোনো সাড়া পেলাম না।

হঠাৎ একদিন একটি ফোন এলো। এক মহিলা জানালেন, ক্যামব্রিজের এক বড় কোম্পানি ডেকেছে আমাকে ইন্টারভিউতে।

আমার মন দমে গেল। ক্যামব্রিজ যে এখান থেকে ১২০ মাইলের পথ। আমার মতো ঘরকুনো আনাড়ি ছেলের জন্য ওটা তো দুনিয়ার আরেক প্রান্ত। আমার কাছে তিম্বুক্তুও যা, ক্যামব্রিজও তা।

যা হোক, না বলতে পারলাম না। ইন্টারভিউয়ের বিস্তারিত জানলাম। মহিলা জানালেন, আমিসহ তিনজনের ইন্টারভিউ হবে। সেখান থেকে দুজনকে নেওয়া হবে।

মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, ইন্টার্নশিপ করবই না। কম্পিউটারের দোকানে কাজ করতে করতে এমনিতেই ক্লান্ত। আমার বয়সে ছেলেরা প্রতি সপ্তায় ফুটবল খেলে, সিনেমা দেখে। আর আমি মিস্টার জেফ্রির বাড়িতে এই নিয়ে পাঁচবার গেলাম তার প্রিন্টার কীভাবে কাজ করবে সেটা দেখাতে।

ইন্টারভিউয়ের প্রস্তাবটা সরাসরি ফিরিয়ে দিলে আমার সুপারভাইজার, আমার বন্ধুরা মন খারাপ করত। সরাসরি সেজন্য মানা না করে এক 'ষড়যন্ত্র' ফাঁদলাম। ৩জনের ২জনকে নেবে যেহেতু, না টেকার সম্ভাবনা আছে। আর আমি ইচ্ছে করে ইন্টারভিউ ভালো করে দেবো না। সুপারভাইজারকে বলতে পারব, আমি যোগ্য নই বলে আমাকে নেয়নি। তাছাড়া মা-ও কিছু জানতে পারবেন না।

খাতাকলমে প্ল্যানটা ভালোই করেছিলাম। কিন্তু আমার আল্লাহর ইচ্ছে যে ছিল ভিন্ন।

ইন্টারভিউয়ের দিন এলো। পরিকল্পনামতো খামখেয়ালি টাইপের ইন্টারভিউ দিলাম। কিন্তু তাকদিরে থাকলে ঠেকায় কে! আমার চাকরিদাতারা আমাকে বাইরে যেমন দেখলেন তেমন বিচার করলেন না। তারা আমার অনাগ্রহকে আমার আত্মবিশ্বাস হিসেবে বিবেচনা করলেন। তারা দেখলেন আমি এরই মধ্যে হাজারের ওপর পিসি

বানিয়েছি। আমার অভিজ্ঞতাকে আমলে নিলেন তারা।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফোন পেলাম। আমি টিকেছি।

এদিকে আমি তো পথ খুঁজছি, কীভাবে একটা অজুহাত খাড়া করা যায়। ক্যারিয়ার অফিসে গেলাম। মিস্টার হ্যারিম্যান আমাকে সাবাস বললেন। আমি সাইন করলাম ইন্টার্নশিপ ফরমে। কী অজুহাত দেবো খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু তলে তলে পানি যে অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। আমার থাকার জায়গা পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে ক্যামব্রিজে।

কী আর করা। নিউ ইয়র্ক লেখা কয়েকটা শার্ট কিনলাম। আব্বু আমাকে গাড়িটা দিলেন উপহার হিসেবে (ধন্যবাদ আব্বু!)।

আমার যাত্রা শুরু ক্যামব্রিজে।

প্রথম দিন কাজে গিয়ে পরিচয় হলো নাইজেলের সাথে। তিনি এখানে আমার সুপারভাইজার। গত বছর যারা ইন্টার্ন করতে এসেছেন, এমন লোকদের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে। তাদের এখনো আরো মাস ৬ বাকি শেষ হতে। সবাই বেশ হাসিখুশি।

প্রথম কয়েক সপ্তা মেন্টর হিসেবে আমার জন্য ঠিক করা হলো রণবীর নামে একটি লোককে। তিনি আমাকে কোম্পানির নিয়মনীতি কাজের হালচাল সম্পর্কে শেখাবেন। আমাদের কোম্পানির সব মিলে ৬টা দালান। আয়তন কম করে হলেও হাজার দুই স্কয়ার ফিট তো হবেই। কোথায় কী আছে না আছে, কীভাবে কী করতে সেসবের জন্য রণবীর ভাই রইলেন আশেপাশে।

প্রথম দিনের খুব বেশি কথা মনে নেই। তবে শুরুটা ভালোই হয়েছিল। কাজ করে ভীষণ আনন্দ পেয়েছিলাম। আইটি বিভাগের সবাই হাসিখুশি। কাজটা তেমন কঠিন না হলেও, যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং ছিল। আমার এমনিতেও মনে মনে একটা ইচ্ছা ছিল প্রতিষ্ঠানে কোন আইটি বিভাগ কীভাবে কাজ করে সুযোগ পেলে সেটা দেখা। এখানে কাজ করে আমার দক্ষতা বাড়ার একটা উপায় হলো। অভিজ্ঞতাও সমৃদ্ধ হবার রাস্তা পেল। অবশ্য বাড়িতে থাকা বাবা-মা আর ছোট বোনটার কথা মনে পড়ল খুব বেশি।

দিনশেষে বাড়িতে ফিরছি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অন্ধকার বিছিয়ে পড়েছে রাস্তাজুড়ে। মনে মনে হিসেব করছিলাম আগামী এক বছর মোট কতবার যেতে হবে এই রাস্তা

দিয়ে। হঠাৎ মাথায় বাড়ি খেল—এক বছর! এক বছর এরকম একা একা আমাকে থাকতে হবে এই ক্যামব্রিজে। মনটা তেতো হয়ে গেল। ১৯ বছরের এক তরুণের জন্য ১ বছর যে অনেক অনেক লম্বা সময়। আশপাশ যেমন ভারী অন্ধকার, ঠান্ডা আর মেঘে ঢাকা, মনটাও যেন তেমন অন্ধকার, ভারী আর মেঘে ঢাকা পড়ে গেল।

এখন অবশ্য মানুষদের বলি আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বছর ছিল ওটা। সে বছরই হজ করি। হজে গিয়ে ইসলামের প্রতি আগ্রহ দিনে দিনে আরো বেড়েছিল আলহামদুলিল্লাহ। ক্যামব্রিজে একটা জিমেও যেতাম নিয়মিত। লন্ডনেও ঘুরে এসেছি একবার ক্যামব্রিজ থেকে। আর কত মজার মজার স্মৃতি ওখানে।

ইন্টার্নের সময় যখন শেষ, তখন মনের মধ্যে এক অদ্ভুত দোনোমনা। একদিকে বাবা-মায়ের কাছে যাবার আনন্দ, অন্যদিকে এই শহর ছেড়ে চলে যাবার কষ্ট। ক্যামব্রিজে আমার দিনগুলো ছিল সত্যিই অসাধারণ। কত দ্রুতই না কেটে গেল একটা বছর!

ক্যামব্রিজে ঢুকেছিলাম কী আতঙ্ক নিয়ে। অথচ বের হবার সময় কত অভিজ্ঞতার ঝুলি, কত স্মৃতি। সময়ের ফেরে আল্লাহ যে আমাদের কত সুন্দর বোঝান কোনো জিনিসের আসল মাহাত্ম্য। আমাদের ভুলটা কী, শুরুতে আমাদের মনে অনেক নালিশ, অনেক না-শোকরি। আমার যেমন ছিল বছরের শুরুতে। এই কথাগুলি কত সুন্দর করে বলেছেন ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ, 'আল্লাহ যদি বান্দা আর তাঁর মাঝের পর্দাটা সরিয়ে ফেলতেন, তাকে দেখাতেন কীভাবে তিনি তাঁর কাজগুলো সামাল দেন, যদি দেখাতেন বান্দা নিজে তার যত ভালো চায়, আল্লাহ তারচেয়েও অনেক বেশি ভালো চান তার জন্য, তার অন্তর গলে পানি হয়ে যেত আল্লাহর ভালোবাসায়। আল্লাহর কৃতজ্ঞতায় চিরে ফালি ফালি হয়ে যেত তার হৃদয়।'[১]

---

[১] ইন্টারনেটে এ কথাটি ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহর নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু বাস্তবতা হলো, হুবহু এমন কথা তার কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অবশ্য তার *তরিকুল হিজরাতাইন ও বাবুস সাআদাতাইন* নামে একটি কিতাবে এটার কাছাকাছি একটি বাক্য পাওয়া যায়। সেটা হলো—

فلو كشف الغطاء عن ألطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه حبا له وشوقاً إليه ويقع شكراً له

অর্থ : সুতরাং আল্লাহ যদি বান্দার প্রতি তাঁর সহানুভূতি, পরম দয়া ও কর্মপন্ধতির জানা-অজানা পর্দা উন্মোচন করে দিতেন, তাহলে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় ও তাঁর প্রেমে বান্দার অন্তর বিগলিত হয়ে যেত এবং কৃতজ্ঞতায় সে একেবারে নুয়ে পড়ত। [*তরিকুল হিজরাতাইন ও বাবুস সাআদাতাইন*, পৃষ্ঠা : ১৮০]—শারয়ি সম্পাদক

ক্যামব্রিজে পুরোটা সময় শুধু ভেবেছি, পরিবার থেকে আমি সেই কত কত মাইল দূরে! এখানে আমার একজনও বন্ধু নেই। কোনো পরিচিত মুসলিম নেই। কিছুই করার নেই এখানে। কী নেই সেসব ভাবতে ভাবতে আশেপাশে যা আছে তা খেয়াল করিনি। এখন আফসোস হয়। ক্যামব্রিজের দিনগুলোতে কত কিছুই না আমার চোখের আড়ালে পড়ে ছিল! এখন, এই ১৫ বছর পরে, আমি বুঝি, আল্লাহ আমাকে যে সুযোগ ওখানে করে দিয়েছিলেন, সেজন্য যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জানানো হয়নি তাঁকে।

বিয়ের পর স্ত্রীর কাছে ক্যামব্রিজের অনেক নাম করেছি। বলতাম কখনো সময়-সুযোগ হলে ওকে নিয়ে ঘুরে আসব ওখান থেকে।

কিছুদিন আগে সেরকম এক সুযোগ মিলেছিল।

ক্যামব্রিজের সেই বিজনেস পার্ক, আর আমি যেখানে ছিলাম, সেই জায়গাটা দেখতে সুন্দর একটি দিন ঠিক করে রওনা দিলাম। কিন্তু যাওয়ার পথে রাস্তা ভুল করে ওখানে না গিয়ে পড়লাম ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির সামনে। আমি যেখানে যেতে চাচ্ছিলাম গাড়িতে সেখান থেকে বড়জোর ১০ মিনিটের পথ। অথচ কী আশ্চর্য যখন এখানে ছিলাম, এদিকটায় আসাই হয়নি একবারও। এর পাশ দিয়ে দুয়েকবার হয়তো গিয়েছি। কিন্তু নেমে দেখিনি কখনো। সেখানকার পরিবেশটা এতই সুন্দর যে, আমার স্ত্রী জানাল, এখানটাই আগে দেখবে সে।

আমরা ইউনিভার্সিটি পৌঁছেছিলাম সকাল ১১টায়। ছিলাম সেই বিকেল ৪টা পর্যন্ত। নদীর পার ধরে হেঁটেছি। ঘুরে ঘুরে দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ভবন। আমাদের দুজনের জন্যই ছিল স্মরণীয় একটি দিন। তবে মজার ব্যাপার, জায়গাটা ওর জন্য যেমন নতুন, আমার জন্যও তেমন নতুন। ক্যামব্রিজে থাকার সময় যে এ দিকটায় কখনো ভুল করেও আসা হয়নি!

যে এক বছর ছিলাম, মাত্র একবারই শুধু ছুটির দিন ক্যামব্রিজে ছিলাম। নইলে সবসময় সপ্তা শেষ হতেই বাড়ি চলে আসতাম। নিজের স্বাধীনতা আর কাজের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে কত কী শিখেছি! অথচ মন শুধু পরিবার, আত্মীয়স্বজন, চেনা শহর আর চেনা মানুষগুলোর কথাই ভাবত। শুক্রবারে কাজ শেষ হতে না হতেই বাড়ির পথ ধরতাম। আর ফিরতাম যত দেরিতে পারা যায়। পরিবার ছেড়ে আসতে একদমই ইচ্ছে হতো না!

একটিবারও আমি দেখিনি কী দিতে পারে আমায় ক্যামব্রিজ। অনেক কিছুর সুযোগ হারিয়েছি আমি।

জীবনে কী নেই তা নিয়েই ভাবতে ভাবতে চলে যায় দিন। আমরা বসে থাকি কবে সবকিছু ঠিকঠাক হবে, তারপরই নাহয় সবকিছু করব। কিন্তু ক্যামব্রিজের দিনগুলো আমাকে কানে ধরে শিখিয়েছে, এরকম মনমানসিকতার কারণ আমাদের মাঝে কৃতজ্ঞতাবোধের অভাব। যা এই মুহূর্তে আছে তা নিয়ে শোকর করি না বলে, অনেক ভালো কিছু আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। আমাদের আশপাশের সুযোগগুলো নিয়ে এরকম চিন্তা আমাদের অন্ধ করে দেয়। নতুন অভিজ্ঞতায় ঝাঁপ দিতে গুটিয়ে থাকি বলে নষ্ট করি সুযোগ।

সামান্য সময়ের কষ্ট লম্বা সময়ের জন্য খুলে দিতে পারে অমিত সম্ভাবনার দুয়ার। একবার এক বোন আমাকে বলেছিলেন, তিনি কখনো শহরের বাইরে গাড়ি চালাতেন না। মনে ভয় হতো যদি পথ চিনে বাড়ি ফিরতে না পারেন। কিন্তু এখন তার মেয়ে গাড়ি চালায়। মেয়ে তাকে নিয়ে কত জায়গায় গিয়েছে ঘুরতে—তা-ও আবার মাত্র একদিনেই। অথচ আজ থেকে ২০ বছর আগে এই কাজটি তো তিনি নিজেই করতে পারতেন! তা না করে তিনি তখন বসে থাকতেন কখন সপ্তা শেষ হবে। স্বামীকে নিয়ে ঘুরতে বেরোবেন। কিন্তু হয়তো দেখা যেত স্বামী ঘরে ফিরছেন ক্লান্ত হয়ে। কোথাও আর যেতে চান না। তখন যদি এই বোনটি ভয়কে জয় করতে পারতেন, এখন এই আফসোস করতে হতো না।[১]

☆☆☆

---

[১] এ ধরনের চিন্তা শরিয়তসম্মত নয়। ইসলাম মেয়েদেরকে স্বামী বা মাহরাম পুরুষ ছাড়া শারয়ি সফর (৫১ মাইল বা তারচেয়ে বেশি পথ অতিক্রম) করার অনুমতি দেয় না। আর শারয়ি সফরের দূরত্বে না হয়ে স্বল্প দূরত্বের পথ হলে এবং আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা থাকলে যদিও মেয়েরা প্রয়োজনবশত একাকী বের হতে পারে, কিন্তু সেটাও উত্তম নয়; বিশেষ করে বর্তমানের এ ফিতনার সময়ে। তাই একান্ত প্রয়োজন ছাড়া মেয়েদের ঘর থেকে বের হওয়াই উচিত নয়। আর খুব প্রয়োজনে যদি বের হতেই হয়, তাহলে সাথে স্বামী অথবা মাহরাম কোনো পুরুষকে রাখার চেষ্টা করতে হবে। এমন কোনো পুরুষ না থাকলে এবং বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়লে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনবশত শরিয়ত তাদেরকে পর্দা ও নিরাপত্তার সাথে একাকী বের হওয়ার অনুমতি দেয় এবং প্রয়োজন পূরণ হওয়ার সাথে সাথে বাড়ি ফিরে আসতে বলে। জেনে বা না-জেনে অনেক মুসলিম পরিবার এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদাসীনতা দেখায়। ঘরের মেয়েদেরকে একাকী ছেড়ে দিতে তারা বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করে না; কোনো চিন্তাও আসে না তাদের মনে। এমন মানসিকতা ঠিক নয়, এটা ইসলামি মানসিকতার পরিচয় বহন করে না। তাই এ ধরনের পশ্চিমা কালচার ও অনৈসলামিক মানসিকতা বর্জন করা আমাদের জন্য একান্ত আবশ্যক।—শারয়ি সম্পাদক

একবার এক ভাইয়ের সঙ্গে কোটিপতিদের ব্যাবসায়িক সাফল্য নিয়ে আলাপ হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন, তিনি এসব লোকদের সাফল্যগাথা শুনে শুনে আর সময় নষ্ট করতে চান না। তার কাছে মনে হয় এদের উদ্যোগের সফল হবার একমাত্র কারণ, তাদের পেছনের খুঁটি শক্ত ছিল।

তার কথায় কিছু সত্যতা আছে। কিন্তু বাস্তবে এটা খুব একটা পার্থক্য করে না। কেউ কারো চেয়ে কয়েক লাখ বা কোটি টাকা বেশি নিয়ে নেমেছে মানেই এই নয় যে, আমাদের সামনে সুযোগ কমে যাচ্ছে। এই তো মাস দুয়েক আগে, আমার পরিচিত একজন সাড়ে ৭ শ হাজার ডলার জোগাড় করলেন ক্রাউড-সোর্সিং করে। অনেক কোটিপতি শুরুতে যত নিয়ে শুরু করেছিলেন তারচেয়ে ঢের বেশি কিন্তু এই সংখ্যা।

আসলে আমাদের মধ্যে ওরকম চিন্তা চলে আসছে 'দড়িতে বাঁধা হাতির' কারণে।

একবার এক লোক যেতে যেতে দেখলেন একটি সার্কাস-দলকে। সেখানে বেশ কিছু হাতি বেঁধে রাখা হয়েছে। হাতিগুলোর সামনের একটি পা মাত্র একটি দড়ি দিয়ে বাঁধা। তিনি অবাক হলেন। কোনো শেকল নেই। কোনো খাঁচাও নেই। হাতিগুলো তো চাইলেই দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যেতে পারে। সামান্য একটা দড়ি কীভাবে ওদের আটকে রাখল?

দর্শক লোকটা সার্কাসের একজনকে জিজ্ঞেস করল এ ব্যাপারে। উত্তরে তিনি বললেন, হাতিগুলো যখন খুব ছোট ছিল, ওদের পায়ে ঠিক এরকম একটা রশি দিয়ে বেঁধে রাখা হতো। ওরা তখন ছুটে পালাবার জন্য দিনরাত চেষ্টা করে যেত। ছোট্ট সেই হাতিগুলোর পক্ষে এমন শক্ত রশি ছিঁড়ে ফেলা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। একপর্যায়ে ওরা হাল ছেড়ে দেয়। ধীরে ধীরে ওরা বিশ্বাস করতে শুরু করে, এটাই ওদের নিয়তি। এই দড়ি ছিঁড়ে পালাবার শক্তি ওদের নেই। এখন ওরা পূর্ণবয়স্ক। ওদের গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। কিন্তু আজও ওদের মাথায় গেঁথে রয়েছে, এই দড়ি ছিঁড়ে ফেলা ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য আর চেষ্টাও করে না ওরা।

ঠিক এরকম কারণেই আমাদের অনেকে ব্যবসায় ঝোঁকেন না। অচেনা অজানার ভয় আমাদেরকে ঘর থেকে বের হতে দেয় না। আমরা মনকে অজুহাত শোনাই, আমার 'আইডিয়া' তো অত ভালো না। আমার হাতে অত 'টাকা' নেই। কিংবা এখন বাজার ভালো না। কিংবা অন্যরা আমার চেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান।

অথচ বেশিরভাগ বড় বড় ব্যবসা একসময় শুরু হয়েছিল খুব সামান্য এক আইডিয়া থেকে। এসবের প্রতিষ্ঠাতার পকেটে সামান্যই পয়সা ছিল। আর্থিক মন্দা তাদেরও কাটাতে হয়েছে। ইতিহাস তো বলে, ১৯২৯-১৯৩১ সালের মধ্যে সূচনা হয়েছিল সবচেয়ে বেশিসংখ্যক কোটিপতিদের। অথচ ওই সময়টায় চলছিল 'দা গ্রেট ডিপ্রেশন'—অনেক বড় আর্থিক মন্দা। কী নেই তার বদলে ওসব কোটিপতিরা নজর দিয়েছিলেন কী সম্ভব সেদিকে।

যেকোনো কাজে নামতে প্রস্তুতি নেওয়া আর যথেষ্ট পরিকল্পনা নেওয়া সবচেয়ে জরুরি জিনিস। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ে আমরা বাহ্যিক সুযোগ-সুবিধার ঘাটতিকে অজুহাত বানিয়ে বসে থাকি।

আমাদের সামনে এই মুহূর্তে যেসব সুযোগ আছে সেগুলো নিয়ে কৃতজ্ঞ থাকা দরকার। অচেনা কিছু মানে নতুন কিছু শেখার সুযোগ। নতুন আকাশে ডানা মেলার অমিত সম্ভাবনা।

বৃত্তের বাইরে স্বপ্নিল জীবন

[গৎবাঁধা চিন্তা ভিতুদের কাজ]

> আপনি অন্যদের চেয়ে আলাদা বলে, সমাজের বাঁধা ছকে চলেন না বলে লোকে আপনায় অপছন্দ করতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, মনের গভীরে তারা আফসোস করে, যদি আপনার মতো হবার সাহস থাকত তাদের!—কেভিন হার্ট

সময়টা ১৮৯৩ সাল। এক ইতালীয় যুবক, বয়স তখনো ২০ পার হয়নি, পদার্থবিদ্যার এক অনুমানের কথা জানাল বন্ধুদের। তার বিশ্বাস ছিল মানুষ বেতারে সংকেত পাঠাতে পারবে। তার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের চোখে বিষয়টা ভালো ঠেকল না। যত যা-ই বলুক, বাতাসের ভেতর দিয়ে কীভাবে তথ্য পাঠানো সম্ভব? বিড়াল কি শত চেষ্টা করেও আকাশে উড়তে পারবে?

তার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা তাকে মানসিক হাসপাতালে যেতে বলল।

১৮৯৫ সালে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূরে সেই যুবক এক শব্দ-সংকেত পাঠাল বেতারে। ১৯০৯ সালে সেই যুবক, গুইলিয়েমো মার্কোনি যার নাম, নোবেল পুরস্কার পেলেন বেতার যোগাযোগে 'অভিনব' উদ্ভাবনের জন্য।

মার্কোনি নিজের বাস্তবতায় বিশ্বাস রেখে কাজ করে দুনিয়া বদলে দিয়েছিলেন চিরতরে।

☆☆☆

হাসিবের মনে সবসময় একটা প্রশ্ন ঘুরত—'টাকাপয়সা কামানো আর বাবা-মায়ের দেখাশোনাই যদি হয় সবকিছু, তবে এগুলো করতে ডাক্তারই কেন হতে হবে তাকে?'

স্কুলে হাসিবের রেজাল্ট তেমন আহামরি ছিল না। পরীক্ষায় কখনো তেমন ভালো নম্বর পেত না। হয়তো সবসময় তার মনমগজে একটা চিন্তাই ঘুরপাক খেত। স্কুলশেষ করে কী ধরনের ব্যবসা দেবে সে।

তার বাবা-মায়ের চিন্তা ছিল অবশ্য ভিন্ন। বেশিরভাগ ভারতীয় বাবা-মায়ের মতো তারা চাইতেন ডাক্তারি করেই কিছু একটা হোক হাসিবের।

তার বাবার ছিল এক দোকান। সপ্তায় ৬ দিন সেই ভোর ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত দোকানে থাকতেন তিনি।

বাবা-মায়ের একটাই স্বপ্ন—কলেজ শেষ করে ছেলেকে ডাক্তার হতেই হবে। বাধ্য হয়ে হাসিবকে সেটা পড়তেই হলো। ছুটির দিনগুলোতে তার বন্ধুরা লাইব্রেরিতে সময় কাটাত 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পড়ে। আর হাসিব ব্যস্ত থাকত নাইকি আর রিবকের রানিং জুতা কোনটা এনে বেচা যায় সেই ধান্ধায়।

প্রথম বর্ষের পরীক্ষা শুরু হবে এক সপ্তাহ পর। হাসিব ২০ জোড়া নাইকি এয়ার জুতোর অর্ডার দিলো। ঠিকানা দিলো তার হোস্টেলের।

চার বছরে এর আগে হাসিব ৫ বার চেষ্টা করেছে পণ্য কিনে 'ইবে'তে বেচবে বলে। প্রথমে কফি টেবিলের চেষ্টা করেছিল। এরপর টেডি বিয়ার পুতুল, তারপর গহনা, আর সব শেষে বক্সিংয়ের দস্তানা। সবগুলোতেই সে টাকা খুইয়েছে। কিন্তু এইবার তার মন যেন অন্য কিছু বলছিল। সে দেখল তার পরীক্ষা শেষ হতে হতে পণ্যগুলো চলে আসবে। এরপর ছুটির মধ্যে দুই সপ্তাহ ধরে ইবে আর অ্যামাজনে সে এগুলো বিক্রির চেষ্টা করবে। তারপর সোজা বাড়ি চলে যাবে।

কিন্তু বিধিবাম। পণ্যগুলো পরীক্ষা শেষে তার হোস্টেলের ঠিকানায় এলো না।

হাসিবের ডেবিট কার্ডের নিবন্ধন করা ঠিকানা দেওয়া ছিল তাদের বাড়ির। প্রথম অর্ডার ছিল যেহেতু, সরবরাহকারীকে এজন্য ডেবিট কার্ডে নিবন্ধন করা ঠিকানায় পাঠানো ছাড়া গতি ছিল না।

ওদিকে বাসায় হাসিবের বাবা-মা তো এতগুলো কার্টন দেখে অবাক। ঘটনা জানতে পেরে ভীষণ মন খারাপ করলেন তারা। ছেলের পড়াশোনার প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। অথচ জুতো কেনাবেচা নিয়ে তার কত আগ্রহ!

বেশ ক-মাস কেটে গেল। এতদিন পরেও আরো এক জোড়া জুতো বিক্রি বাকি। ইবেতেই বেশিরভাগ জুতো বিক্রি হয়েছে। কিন্তু যতটা ভালো সে আশা করেছিল সেরকমটা হয়নি। তার খুব অবাক লাগল। নাইকির এই জুতোগুলোর চাহিদা তো কম নয়। কিন্তু তারপরও তার এই জুতোগুলো ভালো বিক্রি হলো না কেন?

ইবেতে দেওয়া অন্য বিজ্ঞাপনগুলো সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে বসল। কখন যে ৬ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে—কোনো খবর নেই। একটা কেমন সূত্র যেন তার চোখে পড়ল। অন্যরা দামটা কম রাখেনি। তবে তারা পণ্যগুলোর ভালো ছবি দিত। গ্রাহকদের থেকে শতভাগ ভালো মন্তব্য পেয়েছে। আর তারা পণ্যগুলোর ভালো একটা বিবরণ দিত।

হাসিবের পণ্যগুলোর বেলায় ভালো মতামত তেমন আসেনি। বেশিরভাগ সময়ে তার পাঠানো পণ্যগুলো গেছে নির্ধারিত সময়ের পরে। হাসিব মনে করত, দাম কমালেই বুঝি আগ্রহ বাড়বে। সে পণ্যের বিবরণে বেশি নজর দিত না। কিন্তু এখন তো এসব নিয়ে কিছু করার নেই। যা হোক, তবু দেখার জন্য, শেষ জুতোজোড়া বিক্রিতে নিজের আবিষ্কার করা সূত্র খাটিয়ে দেখতে চাইল সে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিক্রি হয়ে গেল জুতোজোড়া। মনে হচ্ছিল এবার কপাল খুলবে। কিন্তু ঠিক ওই সময়েই ডাকে রেজাল্ট পৌঁছাল। ৫টির মধ্যে ২টিতে ফেল করেছে হাসিব। আবার পরীক্ষায় বসতে হবে ওগুলোর জন্য।

বাবার মন-মেজাজ গেল খারাপ হয়ে। তিনি হাসিবকে কড়া কথা শোনালেন, হয় ঠিকমতো পড়াশোনা করবে, আর নয়তো পরের দিন থেকে বাবার দোকানে বসতে হবে। দোকানেও যদি বসতে না চায়, তাহলে পরের সেমিস্টারে সোজা ভারতে চালান করে দেওয়া হবে তাকে। বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার করবে ওখানেই।

বলাই বাহুল্য—ওপরের কোনোটাই হাসিবের মনঃপূত ছিল না।

হাসিবের মাথায় কিন্তু তখনো চলছে সেই একই কথার ঘূর্ণিঝড়—ঘরের বিল ভরা

আর বাবাকে দোকানে বসা থেকে রেহাই দেওয়াই যদি হয় আসল কথা, তাহলে রোজগার হালাল হলেই তো হলো। সেই টাকা ডেন্টিস্ট হয়ে মানুষের দাঁত সাফ করে আসছে নাকি জুতো বেচে আসছে, তাতে কী আসে-যায়?

সেপ্টেম্বর মাসে হাসিব ফিরে এলো ডেন্টাল ইউনিভার্সিটিতে। সামনের ৬ মাসের জন্য তার থাকার জায়গার ভাড়া দিয়ে দেওয়া ছিল। এই সুযোগটা নিল হাসিব।

আবার পরীক্ষা দেওয়ার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। সে এক মোবাইল কোম্পানির কলসেন্টারে চাকরি নিল। ভালো গ্রাহকসেবার জন্য সুনাম ছিল এই কোম্পানির। পরের ৩ মাস এখানেই চাকরি করল হাসিব। ৪ দিন কাজ করে। ৩ দিন ছুটি। ছুটির দিনগুলোতে সে জুতো কিনে ইবেতে বেচত। সেখান থেকে যে অল্পকিছু লাভ হতো, সেটা দিয়ে আবার নতুন জুতো কিনত। ধীরে ধীরে সে জুতো বিক্রির কৌশল ধরে ফেলল। ভাবল, এবার তবে আরেকটু দামি কিছু বেচার চেষ্টা করা যাক।

হাসিব বর্তমানে রান্নাঘরের জিনিসপাতি ফিটিংস বেচে। ইবেতে তার স্টোরটি এখন অন্যতম জনপ্রিয় স্টোর। তার অধীনে আজ কাজ করে ৭ জন। বাবা-মায়ের বাসা থেকে কাছেই তার গুদামঘর।

ডেন্টাল ইউনিভার্সিটি শেষ করে ফেরার ১ বছরের মাথায় তার বাবা দোকান বেচে দিয়েছিলেন। এখন তার দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে খবরের কাগজ পড়ে। সন্ধ্যা কাটে তার অন্যান্য দোকানদার বন্ধুদের সাথে খোশগল্প করে। হাসিবের মায়ের সঙ্গেও ঘরে সময় কাটে ভালো।

হাসিব এখন ঘরের সব খরচপাতি দেয়। নিজেদের রান্নাঘরের জিনিসপাতি তো সে নিজে কিনেই লাগিয়েছে। ইদানীং ছোট বোনের বিয়ের জন্য টাকা জমাতে শুরু করেছে হাসিব।

হাসিবের বাবা এখনো তার বন্ধুদের বলতে সাহস পান না যে, ছেলেমেয়েরা নিজের কাজ নিজে বেছে নিক। তবে এখন আর ছেলেকে অন্তত ডেন্টিস্ট হতে জোরাজুরি করেন না।

হাসিব তার নিজের মনের ডাকে সাড়া দিয়েছিল। আজ সে তার ফল পাচ্ছে।

☆☆☆

আমাদের আপন বাস্তবতা বোঝা থেকে কী এক অদ্ভুত উপায়ে পশ্চিমা সমাজ টেনে ফেলে দেয় আমাদের। মনমাফিক কাজ করতে দেয় না। আমাদের আবদ্ধ হৃদয় আমাদের অনুভূতিকে একেবারেই ব্যবহার করতে দেয় না। পুরোটা সময় আমাদের বলে আমাদের যুক্তিবুদ্ধি খাটাতে। অথচ ভারতে একটা লম্বা সময় থেকে ফিরে এসে অ্যাপলের প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জবসের উপলব্ধি ছিল এটাই—

'ভারতে গিয়ে যতটা না সাংস্কৃতিক ভিন্নতায় ধাক্কা খেয়েছি, ফিরে এসে অ্যামেরিকাতে তারচেয়ে অনেক বড় ঝাটকা খেয়েছি। ভারতের গ্রামে-মফস্বলে লোকজন আমাদের মতো এত টায়টায় যুক্তিবুদ্ধি খাটায় না। তারা তাদের মনের কথা শোনে। বাকি দুনিয়ার চেয়ে তাদের এই হৃদয়বৃত্তি অনেক উন্নত। মানুষের অন্তর্দৃষ্টি খুবই শক্তিশালী জিনিস, এমনকি তা মানুষের যুক্তিবুদ্ধির চেয়েও অধিক শক্তিশালী। আমাদের কাজেকর্মে রয়েছে এর ব্যাপক ভূমিকা।'

আমরা ধাঁধার সমাধান খুঁজি স্প্রেডশিটে, পাঠ্যপুস্তকে, গবেষণাপত্রে। অথচ খুঁজে দেখি না আমাদের আপন জগতে।

আমাদের বাস্তব জ্ঞান আমাদের মুক্ত করে আপন মনের কারাগার থেকে। সমাজের বেঁধে দেওয়া ছক থেকে। অবশ্য কোনটা বাস্তব জ্ঞান আর কোনটা মায়া, সেটার মধ্যে ফারাক করতে হবে। প্রথমটা আমাদের চেনাবে আমাদের পূর্ণ প্রতিভা। আর দ্বিতীয়টাকে এড়াতে হবে যেকোনো উপায়ে।

ক্রিস গার্ডনার নামের এক উদ্যোক্তা একসময় ছিলেন সম্পূর্ণ চালচুলোহীন। সেখান থেকে আপন চেষ্টায় উঠে এসেছেন শিখরে। *পার্স্যু অব হ্যাপিনেস* বইতে তিনি বলছেন, 'তুমি কিছু করতে পারবে না'—কাউকে এ কথা বলতে দেবেন না। আমাকেও না। আপনার যদি কোনো স্বপ্ন থাকে, ওটা আপনিই ঠিক রাখুন। লোকে যখন নিজেরা কিছু পারে না, তারা তখন আপনাকে বলে, আপনিও পারবেন না। আপনি কিছু একটা করতে চান, করুন। আর কোনো কথা নেই।'

আপন হাকিকত বোঝা আমাদের লক্ষ্য পূরণের মূল চাবি। কেবল তখনই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত জীবন পাব। হাসিবের মতো লোকেরা মানুষের কথাকে কানে তোলেনি। অন্যের 'হাকিকত', সমাজের 'হাকিকত'কে তারা নিজেদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে দেয়নি। তারা শুনেছে তাদের অন্তরের কথা। তারা কী চায়, সেটা তারা ভালো করেই জানত। সেইমাফিক কাজ করে গেছে সবসময়। তারা তাদের

অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে চলছে আপন হাকিকত বাস্তবায়নে। তাদের জীবনের মাকসাদ পূরণে অন্তর্দৃষ্টিই তাদের পথ দেখিয়েছে। এর নামই বাস্তব জ্ঞানে চলা। এটাই সফলতা আর সুখের মূল চাবিকাঠি।

কী করা উচিত তার বদলে নজর দিতে হবে আমি কী করতে চাই তাতে। নিজের অন্তরঙ্গের সঙ্গো আমাদের বোঝাপড়া যত ভালো হবে, যত ওটার কথা কানে তুলব, তত ভালো হবে আমাদের লক্ষ্যপূরণ, তৃপ্তিবোধ আর সুখ। বিভিন্ন জিনিস বিচারে মনের ক্ষমতা অনেক। কিন্তু ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে অনেক সময়েই এটা ভুল করে। সেদিক থেকে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি এসব ব্যাপারে ভালো কাজ করে।

কানের পাশে সবসময় হৈচৈ থাকবেই। কেউ না কেউ থাকবেই আমাদের দমিয়ে রাখতে। তারা চাইবে তার কথা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে। মর্জিমাফিক কাজ করতে দেবে না সবসময়। কিন্তু এসব হাঙ্গামা আর আপন-মত-চাপিয়ে -দিতে-চাওয়া লোকদের এড়িয়ে নিজের বাস্তব-জ্ঞান মতো কাজ করাই আসল ইমতিহান (পরীক্ষা)। প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ আর প্রতিবন্ধকের মধ্যে এটাই পার্থক্য। নিজের মতো করে যারা জীবন চালায় আর যারা চালাতে পারে না, তারা কি সমান?

সাফল্যের সবচেয়ে বড় অন্তরায়

[না প্রতিভা, না বুদ্ধিমত্তা]

> আমি আপনার অহংবোধটা সরালাম। দেখা গেল, বাস্তবতা সম্পর্কে আপনার চিন্তাভাবনাকে ওটাই ঢেকে রেখেছিল মেঘে।—সামইকার্ডস.কম

ই-কমার্স তখনো আসেনি। এক বাবা আর তার ছেলে মিলে কম্পিউটার-ব্যবসা শুরু করল। কীভাবে কম্পিউটার অ্যাসেম্বল করতে হয় ছেলেটির সেটা জানা ছিল। কর্মীদের সে শেখাল এ ব্যাপারে। বিল আর হিসেবের ব্যবস্থা করে ভালো একটা সম্পর্ক হলো তার সরবরাহকদের সাথে।

ওদিকে বাবা খেয়াল রাখতেন কাগজপত্র, হিসেবের খাতা আর প্রশাসনিক বিষয়গুলো। তিনি ব্যবসাটাকে লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে দাঁড় করালেন। পণ্যের সংখ্যা বাড়াতে বিনিয়োগ করলেন। কর্মী নিয়োগ আর ছাঁটাইও করতেন তিনি।

ছেলের দায়িত্ব ছিল ব্যবসার প্রযুক্তিগত দিকগুলো দেখাশোনা করা। অন্যদিকে বাবা ছিলেন ব্যবসার ম্যানেজার।

প্রথম বছরে সব মিলে আয় হলো ১৫ লাখ ডলারের কিছু কম। ছোটখাটো একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য কম না কিন্তু!

তখন সবেমাত্র লোকজন ঘরে মডেম কিনতে শুরু করেছে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট

তখন অ্যামেরিকার প্রায় সব বাড়িতে। ইন্টারনেটের গতি অবশ্য তখন অত বেশি নয়।

সে সময়ে অ্যামাজন শুধু বই বিক্রি করছিল। আর ইবের বিস্তার শুধু অ্যামেরিকাতেই। বেশিরভাগ কোম্পানির তখন ওয়েবসাইট বলতে কিছু ছিল না। ওয়েবসাইট থেকে বেচাবিক্রি তো অনেক পরের কথা। কিন্তু সেই ছেলে বুঝতে পেরেছিল, একসময় ওয়েবসাইটই হবে বেচাবিক্রির নতুন হাটবাজার।

ব্যবসার লাভের টাকা ই-কমার্সে বিনিয়োগের পরামর্শ দিলো ছেলে। কিন্তু বাবা ওদিকে নজর দিতে চাচ্ছিলেন না। তিনি চাচ্ছিলেন যেমন আছে তেমনই থাক। ব্যবসা ভালো চলছে। পরিবর্তনের কী দরকার? ই-কমার্সে এখন খরচ অনুপাতে লাভ তেমন হবে না। অফলাইন কেনাকাটায় লাভ বেশি থাকে কোম্পানির।

ছেলেটি বাবাকে সামনে বিশাল সম্ভাবনার কথা বোঝাতে চাইল। ভবিষ্যৎ মার্কেট ধরার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না। কিন্তু বাবা বললেন, 'দৌড়ানোর আগে হাঁটা শেখো।'

এরপর ৫ বছরের মধ্যে অ্যামাজন বেচতে শুরু করল ইলেক্ট্রিক পণ্য। ইবে ছড়িয়ে পড়ল অ্যামেরিকা ছাড়িয়ে বাকি বিশ্বে। অনলাইন মার্কেটে ছড়াছড়ি পড়ে গেল কম্পিউটার স্টোরের। এত এত প্রতিযোগিতায় ছোট্ট সেই কোম্পানিটি উড়ে গেল তাসের ঘরের মতো।

কোম্পানির আগের সেই লাভ এখন সোনালি অতীত।

☆☆☆

সিলিকন ভ্যালি থেকে খুব দূরে নয় জায়গাটা। ওখানকার এক লোক ই-কমার্সে এক বিপ্লবী চিন্তা নিয়ে এগোলেন। ই-কমার্স ততদিনে বেশ বড় ব্যবসার ক্ষেত্র। কিন্তু লোকটির মনে হয়েছিল তার আইডিয়া ই-কমার্স মার্কেটকে আরো চটকদার করবে। বাড়াবে এর সম্ভাবনা।

নিজের বিপ্লবী চিন্তায় প্রচণ্ড আস্থা ছিল তার। সম্ভাব্য বেশ কিছু বড় বড় বিনিয়োগকারীর সাথে নিয়মিত বসতে লাগল জেমস। তবে বসার আগে সবাইকে বলে নিত, এ বিষয়টা যেন তারা কারো সাথে শেয়ার না করেন। এজন্য এনডিএ

বা গোপন রাখার চুক্তিও করত। এতই আত্মবিশ্বাস ছিল জেমসের তার আইডিয়াটি নিয়ে। জেমস যে নতুন কিছু নিয়ে নামতে যাচ্ছে সেটা জানত তার পরিবার আর কাছের লোকজনও। কিন্তু তারাও জানত না, তার বিপ্লবী আইডিয়াটি যে আসলে কী।

অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টরদের কেউ কেউ মৌখিক আগ্রহ জানিয়েছিলেন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে তারা প্রোডাক্টের একটা বাস্তব রূপ দেখতে চাচ্ছিলেন। জেমসের কাছে তখন আসলে ওই আইডিয়াটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কোনো বাস্তব প্রোডাক্ট বা প্রতিরূপ—কিছুই না।

এক আইটি চাকরি থেকে বেশ ভালো বেতন পেত জেমস। সে চাকরিটা ছেড়ে দিলো। স্ত্রীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাড়িটাও বন্ধক দিলো। বাড়তি টাকা দিয়ে নিয়োগ দিলো দুজন প্রোগ্রামার। শুরু করে দিলো তার প্রোডাক্টের কাজ।

সাধারণত অন্যান্য কোম্পানি একটা প্রোডাক্ট রেডি করতে যত সময় নেয়, তাদের লাগছিল এরচেয়েও প্রায় ৩ গুণ বেশি সময়। ঠিক কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে তারা কাজটি করবে সেটা ঠিক করতে করতেই সময় চলে যাচ্ছিল অনেক। জেমসের বিশ্বাস ছিল, প্রোডাক্টটা যেহেতু বের হতেই ঝড় তুলবে, শুরু থেকেই সেজন্য সবকিছু ঠিকঠাক হওয়া লাগবে।

এদিকে ওই দুই প্রোগ্রামারের সাথেও তার এনডিএ চুক্তি হয়েছিল। তারা কাজটা নিয়ে কাউকে কিছু বলতে পারবে না। করলে সাথে সাথে চাকরি হারাবে তারা।

জেমসদের বানানো সফটওয়্যারটির ফিচার কী কী হবে সেটি নিয়ে মতবিনিময় হচ্ছিল। প্রোগ্রামাররা বলল, জেমস যেসব ফিচার চাচ্ছেন সেগুলো সব করতে অনেক দিন সময় লাগবে। তারা পরামর্শ দিলো, শুরুতে অল্প কিছু ফিচার দিয়ে একটা বেটা সংস্করণ বের হোক। লোকজন ধীরে ধীরে ওটার সাথে পরিচিত হবে। ইনকামও আসতে শুরু করবে। আর ওতে নতুন নতুন বিনিয়োগও টানা যাবে। সামনে তাহলে সবগুলো ফিচার দিয়ে সফটওয়্যারটি এগিয়ে নেওয়া যাবে সহজে।

কিন্তু জেমস বলল, 'আমি জানি অন্যরাও এভাবে কাজ করে। কিন্তু আমার আইডিয়াটা এত ভালো, আমি বাজারে এত আগেভাগে ছেড়ে ঝুঁকি নিতে চাই না। আপনারা কাজ করে যান।'

প্রায় বছরখানেক পরে জেমসের টাকাপয়সায় টান পড়ল। সফটওয়্যারটির কাজ আর শেষ হয়নি। ততদিনে প্রযুক্তি জগতেও পালাবদল হয়েছে। তাদের সফটওয়্যারের অনেক কিছুই তখন সেকেলে।

জেমসের বিপ্লবী চিন্তা তো মারা গেলই, সাথে স্ত্রীর সাথে সম্পর্কটাও।

☆☆☆

২৮ কি ৩০ বছরের এক যুবক। নাম ডেভিড। কিছু দিন আগে তার বাবা মারা গেছে। ভালোই সম্পদ রেখে গেছে উত্তরসূরির জন্য।

জীবনে এর আগে কখনো ডেভিড কাজ করেনি। এবার সে ঠিক করল কিছু করবে। সে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজ ধরল।

মাসখানেকের মধ্যে এক ক্লায়েন্টের অর্ডার এলো। তারা ব্যবসার জন্য নতুন ওয়েবসাইট খুলবে। ডেভিড ওটা তৈরি করে দেবে।

এসব কাজে যত লোক দরকার, ডেভিড নিল তারচেয়ে দুই গুণ বেশি লোক। কাজ শুরুর আগে জাঁকজমক এক পার্টিও দিলো। ভাড়া নিল তিন তলা অফিস। দলের সবাই আপত্তি করল ডেভিডের এমন সিদ্ধান্তে। যেখানে এক তলার মধ্যেই সবার জায়গা হয়ে যায়, সেখানে তিন তিনটি তলা তো অনেক বেশি।

কাজ শুরু হলো ওয়েবসাইট বানানোর। যারা কাজ করছিলেন, বললেন চাকরির নিয়োগপত্রে কিছু সমস্যা আছে। আর ডেভিড যেভাবে ওয়েব ডেভেলপ করতে চাইছে, যে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে চাচ্ছে, আর যেভাবে লোকজনদের কাজ ভাগ করে দিয়েছে সেটা তেমন ফলপ্রসূ হবে না।

কর্মীদের মধ্যে একজনের অভিজ্ঞতা ছিল বেশি এসব কাজে। বাকি সবার চেয়ে তিনিই এসব বিষয় বারকয়েক নজরে আনলেন ডেভিডের।

একদিন দুপুরে খাবার সময় তার সঙ্গে ডেভিড বিশেষ মিটিংয়ে বসল। তাকে সাবধান করে বলল এসব বিষয়ে বেশি নাক না গলাতে। আর বাকিদের প্রথম সপ্তার বেতন কেটে নিল এত 'মতামত' দেওয়ার কারণে।

চাকরি খোয়ানোর আশঙ্কায় কেউ আর সামনে কোনো রা করল না। নীরবে কাজ করতে লাগল।

কর্মীদের মধ্যে দিনদিন কাজ নিয়ে টেনশন শুধু বাড়লই। অনেক কাজ রয়ে গেল আধা খেঁচড়া। কোনো কোনো কাজ করতে হতো দু-তিন বার। কোনো কোনো কাজ তো রয়ে যেত একদম অসম্পূর্ণ। কাজের মতিগতি দেখে তাদের মনে হচ্ছিল ক্লায়েন্ট সম্ভবত কাজ শেষে কোনো পয়সাই দেবে না। কিন্তু ডেভিড নাছোড়বান্দা। সে বলল, সে বেশি জানে। কর্মীরা তাদের কাজে মন দিক।

এদিকে ডেভিড নিজে মৌজমাস্তি করে বেড়াচ্ছিল। এই ইউরোপে তো এই অ্যামেরিকায়। কখনো স্কাই ডাইভিং করছে, কখনো খেলছে টেনিস। মন ভালো না থাকলে সৈকতে বসে বসে গিলছে পিনা কোলাডাস।

আর মাঝে মাঝে কিছু নামকরা লোকদের সঙ্গে ব্যাবসায়িক বৈঠক। এসব বৈঠকে সে জাহির করত, অল্প কদিনের মধ্যে 'ত্রিশের নিচে ত্রিশ' সেরা সিইও-দের তালিকায় নাম উঠবে তার। প্রতি বছর একটা ম্যাগাজিন সেরা ৩০ সিইও-র তালিকা ছাপে। ডেভিড ধরেই রেখেছিল এ বছর তার নাম সেখানে উঠছেই।

ওদিকে অফিসে ডেভিডের পরিচালনার ধকল যা যাবার সব যাচ্ছিল কর্মীদের ওপর দিয়ে। অবস্থা এত নাজুক, কর্মীরা কষ্টে কাঁদছিল পর্যন্ত।

বহুদিন বাদে একদিন ঘুরেফিরে অফিসে উদয় হলো ডেভিড। এসে দেখে কাজ এখনো শেষ হয়নি। পুরো টিমকে দাবড়ানি দিলো সে। বড়দিন আর নববর্ষের ছুটিতেও তাদের কাজ করতে হলো রাতদিন করে।

বড়দিনে এবার আর ক্রিস্টিনার ডিনার করা হলো না মায়ের সাথে। বড়দিনের সকালে কেনের কাছে ডেভিডের ফোন এলো। যেকরেই হোক নতুন বছরের মধ্যে কাজ শেষ করা চাই। আর কাজের চাপে লিওনার্ড সময় কাটাতেই পারছিল না তার নতুন জন্ম নেওয়া কন্যার সাথে।

যে কাজ করতে নাকি ৪ মাস লাগে, ৫ মাস পরেও সেই কাজ শেষ হয় না। ক্লায়েন্ট প্রচণ্ড ফুঁসে গেল। চাকরি ছেড়ে দিলো ডেভিডের বেশিরভাগ কর্মী। আর ওদিকে ব্যাংকের দেনায় জর্জরিত সেই কোম্পানি।

☆☆☆

এক বিশাল বড় টেক কোম্পানির সাবেক জ্যেষ্ঠ ডেভেলপার ছিলেন ওয়েন। একবার তিনি চিন্তা করলেন, নিজেই এক আইটি কোম্পানি দেবেন।

কেভিন নামের কম অভিজ্ঞ একজনের সঙ্গো মিলে তিনি চালু করলেন নিজের কোম্পানি। শহরের ছোট ছোট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে আইটি সহায়তা দিতেন তারা।

শুরু থেকেই ওয়েন আর কেভিনের মধ্যে এক দ্বন্দ্ব চলছিল কে হবে কোম্পানির মূল পরিচালক এই নিয়ে। ওয়েন বলছিলেন, তার পরিচালনায় না চললে কোম্পানি কখনোই আগাবে না। প্রায় ২ বছর এই নিয়ে শীতল লড়াই চলার পর কেভিন হাল ছাড়লেন। পরিচালনার পুরো দায়িত্ব নিলেন ওয়েন।

ওয়েন সামনের দু-বছরে কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট আর বিজনেস ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম ভালো করে দাঁড় করালেন। নতুন আর কোনো গ্রাহক ধরলেন না এই পুরোটা সময়। নজর রাখলেন শুধু পুরোনো গ্রাহকদের ওপর। আর ওদিকে দাপ্তরিক কাগজপত্র আর ট্যাক্সের নথিপত্র ঠিকঠাক রাখায় সময় দিলেন।

কেভিন বলছিলেন পুরোনো গ্রাহকদের পাশাপাশি নতুন গ্রাহক জোটানোর দিকেও নজর দেওয়া হোক। আর নিজেদের কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট আর বিজনেস ইন্টেলিজেন্সের বদলে তার পরামর্শ ছিল কাজটা অন্যদের হাতে ছাড়া হোক। এতে তারা ব্যবসার মূল জায়গায় বেশি নজর দিয়ে লাভ বাড়াতে পারবে।

জবাবে ওয়েন বলেছিলেন, 'ব্যবসার কিছুই জানো না তুমি। ১০ লাখ টাকার বিজনেস দাঁড় করাতে সিস্টেম ভালো হতে হয়। আমরা ওই কাজগুলো অন্যদের দিতে পারব না। আমি যা করছি তাতে অন্ধের মতো আস্থা রাখো, বুঝলে? তুমি তোমার কাজ করে যাও।'

তৃতীয় বছরে ব্যবসা তো সামনে আগালোই না। উলটো পুরোনো গ্রাহকদের থেকেও লাভের অঙ্ক অর্ধেক হয়ে গেল। কেভিন আর পার্টনার নেই। কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট আর বিজনেস ইন্টেলিজেন্সে নিরাপত্তা ত্রুটি দেখা গেল। ওদিকে সময়মতো করের কাগজপত্র জমা দিতে না পারায় কর কর্তৃপক্ষ কোম্পানির বার্ষিক লেনদেনের ওপর ২০% জরিমানা চাপাল।

☆☆☆

লেংলির মতো তুখোড় লোক থাকতেও প্রথম সফল বিমান বানালেন কিনা রাইট ব্রাদারস!

কী ছিল না লেংলির? হার্ভার্ডে পড়াশোনা করেছেন। সরকারের কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগ। তার সঙ্গে কাজ করছিলেন ইঞ্জিনিয়ারদের বিশাল দল। সময়ের সবচেয়ে পাকা মাথারা সব একসাথে হয়েছিল উড়োজাহাজ নির্মাণে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিনা বিমান বানানোর মুকুটটি পেয়ে গেল দুই রাইট ভাই। যাদের না ছিল খুব বেশি পড়াশোনা আর না এত এত টাকাকড়ি।

অহংকার মানুষের আস্থা নষ্ট করে। অন্যদের মনোবল ভেঙে দেয়। মানুষের সৃজনশীলতাকে ফুটতে দেয় না। অথচ উদ্ভাবনের জন্য সবার আগে চাই সৃজনশীলতা। এটা এক নতুন আলো জ্বালানোর মতো।

উস্তায নোমান আলি খানের এক মশহুর লেকচার আছে মানুষের ইগো নিয়ে। তিনি বলেছিলেন, যারা অন্যের উদ্ধত স্বভাবের দিকে আঙুল তুলে, সাধারণত দেখা যায় তারাই বেশি উদ্ধত। তারা অন্যের ভুলচুক নিয়ে এত মজে থাকে, নিজের খামতি দেখার সময়ই পায় না।

এই অংশটুকু পড়ার সময় আপনার মনে যদি ইগোওয়ালা কোনো মানুষের ছবি ভেসে ওঠে, তাহলে সম্ভবত আপনার মধ্যেও আছে ইগোজনিত সমস্যা।

১৯৯৯ সালে ডেভিড ডানিং আর জাস্টিন ক্রুগার একটি গবেষণা করেছিলেন। তাদের কাজটির নাম ছিল, 'আনস্কিলড অ্যান্ড আনঅ্যাওয়ার অব ইট—হাউ ডিফিকাল্টিজ ইন রিকগনাইজিং ওয়ান'স ওউন ইনকামপিটেন্স লেড টু ইনফ্লেটেড সেলফ-অ্যাসেসমেন্টস'। মানুষের স্বভাবের একটি দিক তারা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন এই গবেষণাপত্রে। পরে সেটা পরিচিতি পায় 'ডানিং-ক্রুগার ইফেক্ট' নামে। তারা দেখিয়েছেন, মানুষের মধ্যে একটা একমুখী চিন্তা আছে। অদক্ষ লোকেরা নিজের মুনশিয়ানা নিয়ে এক ধরনের মোহে ভোগে। একটা কাজে তারা যত না দক্ষ, ভাবে তারচেয়ে কয়েক গুণ। তাদের মতে, নিজের সামর্থ্যের ব্যাপারে ঠিক জ্ঞান না থাকলে মানুষ সেটাকে আসলের চেয়ে বড় করে দেখে। আর যার সেই সাথে অন্যের সামর্থ্যের ব্যাপারে ঠিক জ্ঞান নেই, সে নিজের সামর্থ্যকে দেখে আরো বেশি বড় করে।

ভালো সিদ্ধান্ত যিনি নিতে পারেন, তার হাতেই হয় বড় বড় কাজের বাস্তবায়ন। তবে ইগো যার মধ্যে চেপে বসে, শুরুতে হয়তো বিষয়টার ভয়ঙ্কর দিক টের পাওয়া যায় না। সাগরে কোনো জাহাজ যখন একটু একটু করে ভুল দিকে যায়, সেরকম। শুরুতে কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু যখন বোঝা যায় জাহাজটা ঠিক পথে নেই, ততক্ষণে অনেক দূর পাড়ি দেওয়া হয়ে গেছে।

আজকাল মানুষের কাছে বাছাই করার সুযোগ অনেক। টাকাপয়সা খরচ এখন মানুষ করে মুড়িমুড়কির মতো। এখন কোম্পানির ব্যাংক-ব্যালেন্স শুধু কাস্টমারের টাকায় ফাঁপে না। এর সঙ্গে থাকে কোম্পানিকে গ্রাহক কী চোখে দেখে। আর তাই আজকাল কোম্পানির হর্তাকর্তাদের চোখের সামনে থেকে সরাতে হবে অহংকারের ঠুলি। এমন কত কোম্পানি আজ ডুবে গেছে কেবল পরিচালকদের নাক উঁচু স্বভাবের কারণে। কর্মী বা গ্রাহকদের কথা শোনা মানে তো কেবল কান দিয়ে ঢোকা না। মগজে পৌঁছানোও।

ফোর্ড গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ফোর্ডকে নিয়ে একটা কথা চালু আছে। কথাটা অবশ্য তিনি আসলেই বলেছিলেন কি না তার প্রমাণ নেই। যা হোক, তিনি নাকি একবার বলেছিলেন, 'লোকজন আসলে কী চায়, এটা যদি জিজ্ঞেস করতাম, তবে তারা বলত, আরো বেশি দ্রুতগামী ঘোড়া!'

কথার পেছনের ভাবনাটা হয়তো সত্য। কিন্তু মানুষজনকে মোটর গাড়িতে করে নিরাপদে আর দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তার যে চিন্তা, সেটা কিন্তু এমনি এমনি আসেনি। মানুষের মন পড়তে পারার শক্তি না থাকলে এমন চিন্তা তার মাঝে কখনোই আসত না। ওই সময়ে মানুষ দ্রুতগামী ঘোড়া অথবা মোটর গাড়ি চাক বা না চাক, তাদের আসল ইরাদা ছিল আরো কম সময়ের মধ্যে কীভাবে গন্তব্যে পৌঁছানো যায়। হেনরি ফোর্ড ওই জিনিসটাই ধরতে পেরেছিলেন। যারা নিজের যুক্তিবুদ্ধির বাইরে অন্য কিছু শুনতে নারাজ, তাদের দিয়ে এসব হয় না।

মানুষের অহং মানুষকে একদিকে ভাবায় সে-ই সব। কিন্তু ভেতরে ভেতরে দেখায় তার হীনম্মন্যতা।

কমজোর লোকেরা একটা কাজ পুরোপুরি ঠিকঠাক হবার আগে মানুষের সামনে আনার সাহস পায় না। এরা অন্যদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ইজাযত দিতে পারে না। কারো ওপর ভরসা করতে পারে না কোনো কাজ দিয়ে। সমালোচনা তো একবিন্দুও

নিতে পারে না। সমালোচনা খুব গায়ে লাগে তাদের। দুনিয়া-বদলানো চিন্তায় এরা আসলে কখনোই পুরোপুরি ঝাঁপাতে পারে না। নিজেদের উচ্চাশা পূরণেরও যথেষ্ট সাহস নেই এদের।

হীনম্মন্য লোকদের আরেকটা সমস্যা আছে। এরা অন্যদের সবসময় ছোট করে দেখে। নিজে না পারলে আরেকজনকেও পারতে দেবে না—যে করেই হোক। এরা যেন অন্যের পায়ে পাথর বেঁধে তাকে গভীর পানিতে ডুবিয়ে দেয় কিংবা সাঁতারুর পা টেনে ধরে যেন সে পানি থেকে উঠতে না পারে।

আমার খালা একদিন মজা করে বলেছিলেন, 'নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করা নিয়ে কোনো খেলা থাকলে পাকিস্তান নিশ্চিত অলিম্পিকে সোনা জিতত!'

শুধু পাকিস্তানে না অবশ্য, মানুষের এই স্বভাব আছে সবখানে। একেক জায়গায় একেক রূপে প্রকাশ পায় আর কী।

হীনম্মন্য লোকেরা কখনো বন্দর ছেড়ে রওনাই হতে পারে না। আর হলেও বেশি দূর যেতে পারে না। গন্তব্যে পৌঁছানো তো অনেক দূর কি বাত।

মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ আমাদের হামবড়া খাসলত আর হীনম্মন্যতা থেকে বাঁচার তাওফিক দান করুন। আমিন।

সংকল্পের শক্তি

[সাফল্যের শুরু ছোট্ট একটি পদক্ষেপে]

> আমরা এখন জানি, ভাবনাচিন্তা এক আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া। কাজ কিংবা ফলাফলের আগে চাই স্বপ্ন আর কল্পনা। এখন তো স্বাপ্নিকদেরই দিন।—চার্লস এফ. হানেল

চাকরিতে ছুটি পেয়েছি। আমি আর আমার এক বন্ধু ঠিক করেছি ইতালি যাব এবার ঘুরতে। সব ঠিক। একেবারে শেষ মুহূর্তে আমার বন্ধু একটা ঝামেলায় পড়ে গেল। যেতে পারবে না। ঘোরাঘুরি বাতিল।

আমার মন ভীষণ খারাপ। কিন্তু ছুটির দিনগুলো মাটি হতে দেবো না পণ করেছি। কারণ সামনের ৬ মাসে আর এরকম বড় ছুটি পাব না।

কী করব, কোথায় যাব কিছুই ঠিক করিনি। কিন্তু ছুটির দিনগুলো এভাবে নষ্ট যে হতে দেবো না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত। আমার বাজেটও যে খুব বেশি ছিল তা নয়। কিন্তু মাস দেড়েক পরে আমি নিজেকে পেলাম ইউরোপের এক মশহুর রেস ট্র্যাকে। এক দামি পোর্শে গাড়ি চালাচ্ছি ১৪০ মাইল বেগে।

আমার জীবনের অনেক স্মরণীয় এক সময় গেছে সেবার। আমার বাজেটের টানাটানিতে আমি নিজেকে পড়তে দিইনি। আমার দৃঢ়সংকল্পকে কাজে লাগিয়ে আপাত বন্ধ সম্ভাবনার দুয়ার খুলে বের হয়েছি আমি।

এরও আরো কয়েক বছর আগের ঘটনা। নতুন শতাব্দী শুরু হয়েছে মাত্র। খবরের কাগজে পড়লাম পাকভারতে সফটওয়্যার ডেভেলপের কাজ করালে খরচ কম পড়বে।

মাস দুয়েক পরে আমি সোজা গেলাম পাকিস্তানে। সেখানকার তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলাম। ভাড়া করলাম একটা অফিস। আর তাতে নিয়োগ করলাম দুজন ডেভেলপরাকে। ফুলটাইম চাকরি। আমি ইংল্যান্ডে ক্লায়েন্টদের থেকে অর্ডার নিয়ে ৮ হাজার মাইল দূরে পাকিস্তানে আমার অফিসে পাঠাতাম।

তখন সবেমাত্র গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে বেরিয়েছিলাম। খুব বেশি খরচ করিনি কাজগুলো করতে।

☆☆☆
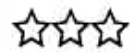
একদিন দুপুরে ঘুমোচ্ছি। আচানক শুনি আমার বোন চিৎকার করে করে আমাকে ডাকছে। আধো ঘুমে মনে হচ্ছিল যেন স্বপ্নে ডাকছে আমাকে। কিন্তু চিৎকারটা আস্তে আস্তে বাড়লই শুধু। সে ঘরে ঢুকে আমাকে জোরে জোরে ধাক্কা মেরে জাগাল ঘুম থেকে। বলল এক্ষুনি তার সঙ্গে রান্নাঘরে যেতে। ওর চোখমুখে এতই আতঙ্ক, খুলে বলতেও পারছে না কী হয়েছে।

রান্নাঘরে যেতে যেতে দেখি কী যেন এক উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। প্রথমে মনে হলো আম্মু বুঝি নতুন কোনো যন্ত্র বসিয়েছে। কিন্তু ঘুমের ঘোর কাটতেই বুঝলাম কী হয়েছে।

আগুন লেগেছে।

আম্মুর প্রেশার কুকার এক বিশাল আগুনের বল হয়ে গেছে। ঘর ভরে গেছে ধোঁয়ায়। আগুনটা এখনই না নেভালে পুরো ঘরে আগুন লেগে যাবে।

ঘরে পুরুষ মানুষ বলতে আমি একা। আমি ছাড়া শুধু আমার দুই বোন আর আম্মু। ঘটনা খুবই বিপজ্জনক মোড় নিচ্ছে।

আগে কখনোই এমন বিপদে পড়িনি। আগুন কীভাবে নেভাতে হয় এমন কোনো অভিজ্ঞতাও নেই। আমি বোকার মতো একটা তোয়ালে ছুড়লাম প্রেশার কুকারটার

দিকে। তাতে আগুন নিভবে কী। উলটো ওটা চুলা থেকে নিচে পড়ল—আগুন এখন রান্নাঘরের কার্পেটে লেগে যাচ্ছে।

কী যে বোকার মতো কাজ করেছি। ভয়ে আতঙ্কে আরো অস্থির হয়ে গেলাম। আমি ছোট বোনকে বললাম এক্ষুনি ফায়ার সার্ভিসে ফোন দিতে। আর এদিকে ভাবতে লাগলাম দ্রুত কী করা যায় আগুন নিয়ন্ত্রণে।

ছোটবেলা থেকেই আগুনে আমার ভীষণ ভয়। একবার ছোটবেলা আমাদেরই পাশের এক বাড়িতে আগুন লেগে মারা গিয়েছিল দুই বোন। রাতের বেলা আগুন লেগেছিল। ওরা ঘুমাচ্ছিল তখন। সেদিন থেকে আগুন লাগার কথা শুনলেই ছোটবেলার সেই পোড়াস্মৃতি মনে পড়ে যায়।

আমি বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছি আগুন নেভানোর। কোনোটাতেই কোনো কাজ হচ্ছে না। বরং আগুনের শিখা আরো বেড়েই চলেছে। আম্মু জোরে জোরে বললেন, আগুন নেভানোর দরকার নেই। সবাই মিলে ঘরের বাইরে চলে যাই। নইলে যেভাবে আগুন বাড়ছে সবাই পুড়ব।

আগুন না নিভিয়ে বের হলে সবাই বাঁচব হয়তো। কিন্তু ঘরের যে ক্ষতি হবে, সেটা আম্মুকে সারাটা জীবন ভোগাবে।

যে করেই হোক আগুন নেভাতে হবেই আমাকে।

আমি আম্মুকে চিৎকার করে বললাম, রান্নাঘরের দরজা খোলো এক্ষুনি। আগুনের বলটাকে আমি কার্পেটে পেঁচিয়ে সোজা আমাদের শানবাঁধানো উঠোনে নিয়ে ফেললাম। এদিকে মনে মনে ধরেই রেখেছি নিশ্চয় গায়ের কোথাও না কোথাও আগুন লেগে গেছেই। এক্ষুনি গড়াগড়ি করতে হবে মাটিতে। যেকোনো সময়ে মনে হয় জ্বালাপোড়া শুরু হবে।

দমবন্ধ করে তাকালাম শরীরে। কী আশ্চর্য! কোথাও কোনো আগুন লাগেনি। শরীরে না হয় লাগেনি, রান্নাঘরের কোথাও না কোথাও নিশ্চয় লেগেছে। দৌড়ে গেলাম রান্নাঘরে। দেখি, ওখানেও আর কোথাও আগুন লাগেনি।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। আল্লাহ আমাকে তো বাঁচিয়েছেনই। ঘরদোরেরও বড় কোনো ক্ষতি হতে দেননি।

কিছুক্ষণ বাদে অগ্নি-নির্বাপনের লোকজন এলো। পরিস্থিতি দেখেশুনে ওদের একজন আমাকে বললেন, আগে আমি কখনো আগুন নেভানোর কোনো প্রশিক্ষণ নিয়েছি কি না। আমি বললাম, 'জীবনেও না। আমি তো আগুনকে ছোটবেলা থেকেই খুব ভয় পাই। আমি আসলে ইউটিউবে কিছু ভিডিও দেখেছিলাম আগুন নেভানোর। ওগুলো থেকেই কিছু একটা চেষ্টা করেছি।'

কর্মীটি অবাক হলেন আমার কথা শুনে। বললেন, আমার প্রথম চেষ্টাটা বোকার মতো হলেও, পরেরটা ঠিক ছিল। বেশিরভাগ সময়ে রান্নাঘরে আগুন লেগে নাকি বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যায়। অন্তত দুয়েকজন তো মারা যায়ই। আমাদের যাওয়ার মধ্যে গেল শুধু একটা প্রেশার কুকার আর কার্পেট।

☆☆☆

দৃঢ় সংকল্পের কথা আর কী বলব! শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যেকোনো কিছুই হাসিল করা সম্ভব, যদি আমাদের সংকল্প, আমাদের প্রতিজ্ঞা অবিচল থাকে, বিশুদ্ধ থাকে, পরিষ্কার থাকে। যদি নিয়তে নজর রাখি, নিয়তকে পোক্ত করি, নিয়ত দুর্বল করতে পারে এমন যেকোনো কিছু থেকে দূরে থাকলে আমাদের লক্ষ্য পূরণ হবেই।

মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ হলেন আল-কাদির, আল-হাকিম। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। সবচেয়ে জ্ঞানী। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মাঝে কত আলামত দিয়ে রাখেন আমাদের জন্য।

কোনো কিছুর জন্য চোয়ালবাঁধা সংকল্প করা যেন মাটিতে বীজ বোনার মতো। ভাবতে পারেন, বীজ বুনে সম্পূর্ণ অজীব একটা জিনিসকে জীবন্ত করার কাজটিও যদি আপনাকে করতে হতো কীভাবে করতেন? প্রতিদিন যদি আপনাকে সালোকসংশ্লেষণ করে দিতে হতো? যদি আপনাকেই বানাতে হতো গাছের কাণ্ড, কোষ আর দিতে হতো রং? এভাবে একটা গাছ বড় করতেই তো জান জেরবার হয়ে যেত। সেখানে হাজার হাজার কোটি কোটি গাছ কীভাবে করতেন?

বিজ্ঞানীরা তো এখনো খুঁজেই পাননি, কী করে নিজেরা একটা গাছ ঠিক স্রষ্টার মতো নিখুঁত করে তৈরি করবেন। আল্লাহর ক্ষমতা আর জ্ঞানের এতই বিস্তৃতি!

বড় মেহেরবান আমাদের আল্লাহ। আমাদের ওপর এত দায়দায়িত্ব চাপাননি। আমাদের শুধু বীজ বুনতে হয়। পানি দিতে হয়। পোকামাকড় আর জন্তু থেকে

মাহফুজ (সংরক্ষিত) রাখতে হয়।

এরকমই বীজ বোনার মতো আমাদের নিয়তকে রাখতে হবে শক্ত আর খালিস। কোনোভাবেই ওটাকে দুর্বল হতে দেওয়া যাবে না। মরতে দেওয়া যাবে না। কোনো কাজের সংকল্পের পর নিজের সবটা দিয়ে মেহনত করতে হবে। কাজটি করতে হবে মনপ্রাণ দিয়ে। এরপর আল্লাহ তাঁর আপন প্রজ্ঞা গুণে আমাদের সংকল্পের ফল দেবেন।

অদৃশ্যের বিষয়গুলো কীভাবে কাজ করে তা পুরোপুরি বুঝতে পারে না আমাদের মস্তিষ্ক। আমরা অনেক সময় বুঝি না প্রায় অসাধ্য কাজটা হবে কীভাবে। কিন্তু আল্লাহর জ্ঞান আর প্রজ্ঞা তো সীমিত না। আমাদের কাজ শুধু তাঁর হাতে সবকিছু ছেড়ে দেওয়া। বাকি পথ তিনিই করে দেবেন। কত কত গাছ তো জন্মে কী বিরূপ পরিবেশে! আল্লাহই তো ওদের বেড়ে ওঠার ব্যবস্থা করে দেন।

আপনি সংকল্প করুন। মেহনত করুন। এরপর বাকি সব তাঁর হাতে ছেড়ে দিন।

নির্মম বাস্তবতা

কাজে কেন বারাকাহ আসে না?

> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পার্থিব চিন্তা যাকে মোহগ্রস্ত করবে, আল্লাহ তার কাজকর্মে অস্থিরতা ঢেলে দেবেন, দারিদ্র্যকে তার নিত্যসঙ্গী বানাবেন এবং পার্থিব স্বার্থ সে ততটুকুই লাভ করতে পারবে, যতটুকু তার তাকদিরে লিপিবদ্ধ আছে। আর যার উদ্দেশ্য হবে আখিরাত, আল্লাহ তার কাজকে সুসংহত করে দেবেন, তার অন্তরকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করবেন এবং দুনিয়া নিজেই তার সামনে এসে হাজির হবে।[১]

ওয়াসিক তার নতুন বাসায় আজ প্রথম গাড়ি রাখবে। তার বাসার গাড়ি রাখার জায়গাটা রাস্তা থেকে একটু নিচে। ওটার পাশে আবার প্রতিবেশীর গাড়ি রাখার জায়গা। প্রতিবেশীর জায়গায় প্রায় ফুটখানেক দেওয়াল ওঠানো।

ওয়াসিক গাড়ি রাখতে গিয়ে ভুল করে একটা চাকা সেই ওয়ালের ওপরই উঠিয়ে দিয়েছে। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে চাকা নামিয়ে বের হয়ে সে ভালো করে দেখল টায়ারে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না।

---

[১] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৪১০৫; *জামি তিরমিযি* : ২৪৬৫; *আল-মুজামুল আওসাত*, তাবারানি : ৫৯৯০, ৮৮৮২; *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি : ১১৬৯০; *তারতিবুল আমালিল খামিসিয়্যা* : ২২৭০; *শুআবুল ঈমান* : ৯৮৫৮; *মুসনাদুল হারিস* : ১০৯২; *আয-যুহদ*, ইবনু আবিদ দুনইয়া : ৩৩২, ৩৩৩, ৪৮৩; *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, খণ্ড : ৬; পৃষ্ঠা : ৩০৭।—হাদিসটি সহিহ

আবছা আলোয় টায়ারে কিছু সমস্যা হয়েছে বলে যেন মনে হলো। কিন্তু সারা দিনের কাজের ধকল শেষে এখন আর ওটা ঠিক করতে মন চাচ্ছিল না। যা হবার তা তো হয়ে গেছেই। সকালে উঠে দেখা যাবে। খুব বেশি হলে হয়তো টায়ারটাই বদলাতে হবে।

সকালে উঠে ভালো করে দেখল টায়ারটা। না, যা ভেবেছিল তেমন কিছুই হয়নি। টায়ার ফাটেনি। আর এখনো যথেষ্ট হাওয়া আছে ভেতরে। তবু একবার এক মেকানিককে দেখাবে ঠিক করল।

মেকানিক সব ভালো করে দেখে বলল, টায়ারে এমন কোনো সমস্যাই হয়নি বলার মতো। গাড়ি চালানো যাবে। চিন্তার কারণ নেই।

ওয়াসিক জানতে চাইল মেকানিককে কোনো পয়সা দিতে হবে কি না। মেকানিক বলল, খালি দেখে দিয়েছে যেহেতু, কোনো টাকাপয়সা দিতে হবে না।

ওয়াসিক বাসায় ফিরে এলো।

বাসার কাছে আসতে দেখে, তার পার্কিংয়ের জায়গায় তার বড় ভাইয়ের গাড়ি। সে রাস্তাতেই রাখল নিজের গাড়ি। পার্কিংয়ের জায়গায় গিয়ে চোখে পড়ল তার মতো তার ভাইও ভুল করেছে গাড়ি রাখতে গিয়ে। কিন্তু তার গাড়ির চাকা পাংচার হয়ে গেছে। আর চাকার রিমেরও ক্ষতি হয়েছে। তিনি কার রিকভারি সার্ভিসে ফোন দিয়েছেন। মেকানিক এসে সব দেখে বললেন, টায়ার তো নষ্ট হয়েছেই, ব্রেক সিস্টেম, এবিএস আর চাকার রিমেরও ক্ষতি হয়েছে।

দুদিন বাদে সব ঠিক করে গাড়ি ফেরত পাঠানো হলো। বিল হয়েছে প্রায় দেড় লাখ টাকা!

তার মানে প্রথম জনের কপাল ভালো ছিল? তাই তো?

ধরুন, এক লোক পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা জানে না। এমন কিছুর অস্তিত্ব আছে বলে কখনো শোনেনি। সে বোঝে না এই জিনিসটা কী। সে ধরুন, উঁচু কোনো জায়গায় হাঁটতে হাঁটতে কিনারে এসে পড়ে গেল। জখম হলো মারাত্মক। এভাবে পড়ে যাবার জন্য দায়ী তো সে নিজেই। কিন্তু মধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা না জানার দায় তো সে স্বীকার করলই না। উলটো দোষ দিলো কপালকে। কিংবা বিলাপ করতে

লাগল, কোন দোষে আল্লাহ তাকে এমন শাস্তি দিয়েছেন।

এখন, এমন নজির হয়তো পৃথিবীতে নেই। কিন্তু আসল যে কথা বলতে চাচ্ছি, তা হলো, পৃথিবীতে যেমন কিছু প্রাকৃতিক কানুন রয়েছে, তেমনি রয়েছে কিছু আধ্যাত্মিক জগতের কানুন। এগুলো অস্বীকার করা যায় না। বদলানো যায় না। যারা এই উভয় জগতের কানুন সম্বন্ধে ওয়াকিফ, তারা জীবনের মানচিত্রে ঠিকঠাক পথ চিনে চলতে পারে।

আমাদের ওপরের গল্পে ওয়াসিক হালাল রোজগার করে। কিন্তু তার ভাইয়ের আবার এসব দিকে কোনো খেয়াল নেই। ওয়াসিক জানে, হালাল ইনকামে মানুষের সম্পদে বারাকাহ আসে। কিন্তু বারাকাহর মতো এই অদৃশ্য জগতের কানুন সম্বন্ধে তার ভাই বেখবর। এর ফল ভোগ করতে হলো তাকে। আধ্যাত্মিক জগতের এমন অনেক কিছু আছে, বিজ্ঞান যেগুলোর হাকিকত ব্যাখ্যা করতে পারে না।

অদেখা জগতের কানুনগুলো আমাদেরকে ইসলামের দিশা দেয়। এগুলো মানবজাতির অনুসরণে দেওয়া মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহর দেওয়া কানুন। প্রাকৃতিক নিয়ম মানা না-মানার ফল আছে। তেমনি আল্লাহর কানুন মোতাবেক চলা না-চলারও পরিণাম আছে।

এই ফল বা পরিণাম কখনো সাথে সাথে আসে, কখনো বা দেরি করে। যেমন : মধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব আমরা সাথে সাথেই টের পাই। ওপর থেকে কিছু ফেললে সাথে সাথেই পড়ে যায়। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলো সাথে সাথে দেখা যায় না। অনেক দিন লাগে। সেরকম আল্লাহর কানুন মানা না-মানার যে কী পরিণাম তা সহজে অনেকের চোখে ধরা দেয় না। বিশেষ করে যারা এগুলোর ব্যাপারে অন্ধ, তাদের চোখে তো নয়ই। কিন্তু আমরা জানি, এগুলো আছে।

বিয়ে না করে শারীরিক সম্পর্ক তৈরির প্রভাব হয়তো প্রাকৃতিক জীবনে তেমন নেই। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে এমন কাজের পরিণাম অনেক ভয়াবহ।

আল্লাহ কুরআনে আমাদের বারবার বলেছেন, তিনি অদেখা জগতের প্রভু। খাঁটি বিশ্বাসীরা ঠিকই এই জগতটাতে বিশ্বাস রাখে। একজন বিশ্বাসীর জন্য অদেখা জগতের আইন-কানুনকে তাজিম করা ও মানা অত্যন্ত জরুরি, একান্ত আবশ্যক।

☆☆☆

একবার আমি ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের এক কাজ করছিলাম চুক্তিভিত্তিক। কাজটায় আমাকে ঘণ্টা হিসেবে সম্মানী দেওয়া হতো। বাসা থেকেই করতাম আমি কাজটা। আমি ছিলাম এই কাজের প্রজেক্ট লিডার।

প্রায় সময়ে দেখতাম, এই কাজের জন্য নিয়োগ পাওয়া আরেক লোক হঠাৎ হঠাৎ অনলাইন থেকে গায়েব হয়ে যাচ্ছে। একদিন মঙ্গলবার, সকালে কাজ করছি। অনলাইনে লোকটাকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করেছিলাম কিংবা করতে বলেছিলাম। লোকটা বলল, সে ১৫ মিনিট পরে আসছে। জানি, তার এই ১৫ মিনিট আর ১৫ মিনিট থাকবে না।

এই সময়ে আমি প্রজেক্টের অন্য কিছু করতে পারতাম। কিন্তু ওই লোকের ঢিলেমি দেখে আমিও কেমন যেন একটু ঢিলেমি করলাম।

ওয়াশিং মেশিন চালু করে কাপড়চোপড় ধুতে দিলাম। কাজের লোক জানাল, কিছু সবজি আর ফলটল পচে গেছে। ওগুলো ফেলে দেবে নাকি। আমি বললাম, মাত্র কালকেই তো কিনেছি। একদিনে কীভাবে পচে যায়?

কাজের লোক বলল, ফ্রিজের তাপমাত্রা কমানো ছিল। তাই পচে গেছে।

যাক সে কথা। আমি কাপড়চোপড় ধুয়ে রান্নাঘরে গেলাম। ভিটামিন ডি-এর সাপ্লিমেন্ট নেব। নিতে গিয়ে ঘটল আরেক কাহিনি। আমার হাতের ধাক্কায় পাশের আরেকটা সাপ্লিমেন্টের বোতল পড়ে প্রায় অনেকখানি জিনিস নষ্ট হলো। এমনিতেই মেজাজটা খারাপ হয়ে ছিল। এখন তাতে আরো আগুন জ্বলে উঠল। মনে মনে ভাবলাম, আজকে এমন কী করলাম যে, আল্লাহ আমাকে এত শাস্তি দিচ্ছেন!

হঠাৎ কী মনে করে আমি হিসেব করলাম, সকাল থেকে যা কিছু নষ্ট হলো তার আর্থিক পরিমাণ কত। আর আমি ঘণ্টাপ্রতি কাজ করে পাই কত। হিসেব করে দেখলাম যত টাকার ক্ষতি হয়েছে, সেটা পোষাতে আমাকে ২৬ মিনিট কাজ করতে হবে।

ওদিকে তখন অনলাইনে সেই লোক ফিরে এসেছে। অবশ্যই ১৫ মিনিটের অনেক পরে। আমি সময় হিসেব করে দেখি, ঠিক ২৬ মিনিটই!

সুবহানাল্লাহ, যে ২৬ মিনিট আমি ক্লায়েন্টকে ধোঁকা দিচ্ছিলাম কাজ না করে,

সেই ঠিক ২৬ মিনিটের কাজের ক্ষতিই হলো আমার সঙ্গো। আল্লাহ সত্যিই আল-আদ্‌ল—সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ।

আমাদের কাজের চুক্তিতে সৎ থাকা খুব জরুরি। নইলে সম্পদে বারাকাহ সম্ভব না। আমি যেহেতু ঘণ্টাপ্রতি চার্জ করেছিলাম, তাই আমার উচিত ছিল, যে সময়টায় কাজ করিনি, ক্লায়েন্টের কাছ থেকে সেটার টাকা না নেওয়া কিংবা কম নেওয়া। অথবা প্রজেক্টের অন্য কোনো কাজ করা।

সৎ থাকা, ন্যায়পরায়ণ হওয়া অদেখা জগতের দুটো কানুন। এরকম আরো অনেক কিছু আছে। এগুলো যত তাড়াতাড়ি জানব বুঝব মানব, অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটলে তখন আর নিজের কপালকে আমরা দোষারোপ করব না।

☆☆☆

আধুনিক সময়ে আমাদের সারাজীবন কেটে যায়, কবে টাকাপয়সার টানাটানি কাটবে সেই স্বপ্ন দেখে দেখে। আমরা টাকাপয়সার ভয়ে বিয়ে করি দেরিতে। সন্তান নিই দেরি করে। কারণ আমরা যে টাকাপয়সার ক্রীতদাস।

আমরা টাকাপয়সাকে দেখি দুর্নীতি আর খারাপ হবার মূল চাবিকাঠি হিসেবে। আমাদের অনেকে সেজন্য সম্পদ গড়তেই চান না। আমরা মনে করি টাকাপয়সা কামাই খালি ভোগবাদী লোভী আর লম্পট মানুষদের জন্য। মিডিয়া বেশিরভাগ সময় টাকার সঙ্গো এগুলোকেই জুড়ে দেখায়।

মিডিয়া বেশিরভাগ সময় আপনাকে দেখায় পশ্চিমা দেশে বেশিরভাগ মানুষ সন্ত্রাসী হামলায় মারা যায়। ওরা দেখায় বেশিরভাগ মুসলিম সন্ত্রাসী। অথচ আসল তথ্য এর বিপরীত। ঠিক এরকম মিডিয়া আমাদের বেশিরভাগ সময়ে দেখায় সম্পদ কেবল সৌভাগ্যবানদের পায়ে লুটায়। কিংবা যারা অনৈতিক কাজ করে তাদের কপালে জোটে।

প্রচার-মাধ্যমের চাই 'ব্যবসা'। সেজন্য তাদের চাই চাঞ্চল্যকর ঘটনা, আর খবরাখবর। সফল উদ্যোক্তাদের তারা এজন্য বেশিরভাগ সময় জাহির করে তুখোড় প্রতিভাবান হিসেবে। কিংবা দেখায় সে চরম সৌভাগ্যবান। অথবা তুলে আনে তার অতীতের অপরাধমূলক কাণ্ডকীর্তি।

আপনারা কি কোটিপতি মনোজ বার্গবের নাম শুনেছেন? আফ্রিকার দরিদ্র মানুষদের বিভিন্ন সমস্যা দূর করতে এই লোকটি তার সম্পদের প্রায় ৯৯ ভাগ বিলিয়ে দিচ্ছেন। সহজ সাধারণ জীবন কাটানো এই মানুষটিকে আপনারা মিডিয়ার কোথাও খুঁজে পাবেন না। কারণ 'খবর' হবার মতো কোনো চটকদার রসদ যে নেই তার কোটিপতি হবার পেছনে।

মিডিয়ায় দেখবেন, ব্যক্তিগত ক্রুজ জাহাজ বা ইয়াক্টে ঘুরে বেড়ানো ভোগমত্ত সব কোটিপতিকে। কিংবা দেখবেন যেসব কোটিপতি মত্ত নারী আর নেশায়। কিংবা সৌদি তেল-ব্যবসায়ীদের যাদের প্রাসাদে বেডরুমের সংখ্যা একশোর ওপরে। আর স্ত্রী আছে মাত্র ২৫ জন! তাদের গাড়ি খাঁটি রুপো দিয়ে বানানো, যা প্রস্তুত করা হয়েছে অডি কোম্পানিকে বিশেষ ফরমাশ দিয়ে। মঙ্গল গ্রহে মানুষকে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করা এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকেরও খবর মাঝে মাঝে দেখি মিডিয়ায়। কিন্তু ধরুন ভারতের লক্ষ্ণৌ থেকে উঠে আসা এক সহজ সাধারণ কোটিপতির কথা আপনি শুনবেন না। শুনবেন, যখন হয়তো তার কোনো কাজের কথা এরই মধ্যে দুনিয়াজুড়ে ছড়িয়ে পড়বে তারপর। কারণ তখন যে আর ওটা মিডিয়ায় না দেখিয়ে উপায় নেই।

টাকাপয়সা মানুষকে নষ্ট করে, এমন কথা কতবার শুনেছেন?

মিডিয়াতে খারাপ-খারাপ পয়সাওয়ালা লোকদের জাহির করার কারণে আমরা টাকাপয়সার কথা শুনলেই মুখস্থ চিন্তা করি। চেষ্টা তো পরে, আমরা চিন্তাই করতে চাই যে, আমাদের পয়সাপাতি হোক। অথচ টাকাপয়সা তো কেবল এক সহায় মাত্র।। আপনি যদি এমনিতেই খারাপ হন, টাকাপয়সা আপনাকে আরো খারাপ করবে। আর যদি দানশীল-দয়াবান হন, টাকাপয়সা আপনাকে আরো বেশি দানশীল করে তুলবে। পয়সাকড়ি আমাদের যদি দুর্বিনীত করে, তার মানে আমরা আগে থেকেই ওরকম ছিলাম আসলে। সুযোগের অভাবে নিজের আসল চেহারা দেখাতে পারিনি। টাকা হওয়ায় এখন দেখা যাচ্ছে।

ধরুন, কাউকে একটা গাড়ি দিলেন। কেউ হয়তো কান-ঝালাপালা-করা বিকট শব্দে বেপরোয়া হয়ে গাড়ি চালাবে। জোরে জোরে মিউজিক বাজাবে। রাস্তায় মানুষের জানও নিয়ে নিতে পারে। অন্যদিকে আরেকজন হয়তো সেই একই গাড়ি চালিয়ে মানুষের কল্যাণে কাজ করবে, দূরে দূরে যাবে আত্মীয়স্বজনদের সাথে দেখা করতে, পরিবার নিয়ে ঘুরতে যাবে ছুটির দিনগুলোতে। গাড়ির কোথাও তো লিখে দেওয়া নেই, এই গাড়িকে কে কীভাবে ব্যবহার করবে। কে কী কাজে লাগাবে সেটা তার

নিজের পছন্দ। গাড়ি তো শুধু একটা উপায়।

কেউ তো কখনো বলে না, গাড়ি তোমাকে নষ্ট করবে। তা হলে টাকাপয়সা রোজগারের বেলায় কেন বলে?

আমাদের চরিত্রে কোনো সমস্যা থাকলে সেটার দায় আমাদেরই; টাকাপয়সার না। আল্লাহর তো কোনোভাবেই না। অথচ আমরা বলতে থাকি, টাকাপয়সা বেশি হলে আল্লাহ আমাদের শাস্তি দেবেন। হয়তো তিনি নারাজ হবেন আমাদের ওপর।

আচ্ছা, আপনার হাতে একটা স্যান্ডউইচ থাকলে আল্লাহ কি আপনাকে শাস্তি দেবেন?

যদি একশটা হয়?

হাজারটা?

বা ধরুন ১ লাখ?

আমাদের এতগুলো স্যান্ডউইচ দেওয়ায় আমরা নিশ্চয় কৃতজ্ঞ হব আল্লাহর প্রতি। এগুলোর সব তো নিশ্চয় রাখব না আমাদের হাতে। নিজেদের জন্য কিছু রেখে বাকি সব দেবো দান করে।

টাকাপয়সা মানুষকে নষ্ট করে না। পয়সার প্রতি মানুষের দেখার চোখ হয় তাকে সম্পদের দাস বানায় কিংবা তাকে মালিকে পরিণত করে। হাতে টাকাপয়সা থাকলে মানুষের নষ্ট হয়ে যাওয়া নিয়ে ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহর পর্যবেক্ষণ কী তীক্ষ্ণই না ছিল! তিনি বলেছেন, 'অর্থসম্পদ যখন আপনার অন্তরে না থেকে হাতে থাকবে, তখন অগাধ সম্পদও আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর সম্পদ যখন অন্তরে ঠাঁই পাবে, তখন আপনার হাতে একটা পয়সা না থাকলেও, ওটা আপনার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'[১]

অনেকে জানেন কি না, যে ১০ জন সাহাবি দুনিয়াতে জান্নাতের খোশখবর পেয়েছিলেন,[২] তাদের মধ্যে দুজন ছিলেন ধনকুবের। একজন উসমান ইবনু

---

[১] *মাদারিজুস সালিকিন*, ইবনুল কাইয়িম, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৪৬৩

[২] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশজন সাহাবিকে জীবিত অবস্থায় জান্নাতের সুসংবাদ

আফ্ফান রাযিয়াল্লাহু আনহু। আর অন্যজন আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু। মদিনায় এসে শুরুর দিনগুলো অবশ্য তাদের বেশ আর্থিক টানাপোড়েনে গেছে।

ইসলাম কখনো কাড়ি কাড়ি সম্পদ গড়তে বাধা দেয় না। ইসলামের নির্দেশনা টাকাপয়সার সঠিক ব্যবহারে। উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু আর আবদুর রহমান রাযিয়াল্লাহু আনহু টাকাপয়সার ঐতিহ্য দিয়ে যাননি। দিয়েছেন আল্লাহভীতি আর দানশীলতার ঐতিহ্য।

পাকা ব্যবসায়ী ছিলেন উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু। একবার মদিনায় দেখা দিলো ভীষণ খরা! পানির ভীষণ অভাব। একটা কুয়ো ছিল মদিনায়, যেটার মালিক এক আরব ইহুদি। মওকা বুঝে চড়া দামে সে মুসলিমদের কাছে পানি বেচত।

সমস্যার কথা মুসলিমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই কুয়ো যে কিনে নেবে, তার জন্য থাকছে জান্নাতের ওয়াদা।

উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু ইহুদির কাছে গেলেন, কুয়ো কিনবেন। বেশ কিছুক্ষণ দরদামের পর ইহুদি রাজি হলো কুয়োর অর্ধেকটা বেচবে। দাম অবশ্য চাইল প্রায় পুরো কুয়োরই। চুক্তি হলো, কুয়োটির মালিক পালা করে একদিন হবেন উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু, আরেকদিন ওই ইহুদি।

দিয়েছেন। তাদেরকে 'আশারায়ে মুবাশশারা' বা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন বলা হয়। এ দশজন সাহাবি হলেন—আবু বকর ইবনু আবি কুহাফা, উমার ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনু আফফান, আলি ইবনু আবি তালিব, তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ, যুবাইর ইবনু আওয়াম, আবদুর রহমান ইবনু আউফ, সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস, সাইদ ইবনু যাইদ, আবু উবাইদা বিন জাররাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুম। [*জামি তিরমিযি* : ৩৭৪৭, ৩৭৪৮; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৩৩; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৬২৯, ১৬৭৫; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৭০০২; *মুসনাদু আবি ইয়ালা* : ৮৩৫।—হাদিসটি সহিহ।]

উল্লেখ্য যে, এ দশজন ছাড়াও আরো কিছু সাহাবি জীবিত অবস্থায় জান্নাতে সুসংবাদ পেয়েছেন, যেমন : খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা, ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা, হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু, হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ। তবে প্রথম দশজন সাহাবি যেহেতু একসাথে একই বৈঠকে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন এজন্য তাদেরকে একসাথে 'আশারায়ে মুবাশশারা' বা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন বলা হয়। এর অর্থ এই নয় যে, এ দশজন ছাড়া আর কেউ দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদ পাননি। সমাজে এ ধরনের কিছু ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। তাই এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।—শারয়ি সম্পাদক

উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিমদের জানালেন, যেদিন তিনি মালিক, সেদিন মুসলিমরা যেন দুদিনের মতো পানি ভরে নেয়। এভাবেই চলল কয়েকদিন।

ইহুদিটি দেখল, যেদিন সে মালিক থাকে, সেদিন আর কেউ আসে না ওটা থেকে পানি কিনতে। একসময় সে বুঝতে পারল, এই কুয়ো থেকে তার আর কোনো লাভ হবে না। তাই সে পুরোটাই বেচে দিলো উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে। উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু কুয়োটি ওয়াক্ফ করে দিলেন মুসলিমদের সুবিধার জন্য।[১]

আজও এই কুয়োর পানি থেকে সুবিধা পাচ্ছে মুসলিমরা। এই কুয়ো নয় শুধু, সংলগ্ন জায়গা থেকে ফল-ফসলের যে লাভ হয়, তা-ও যোগ হয় মুসলিমদের তহবিলে। সাদকায়ে জারিয়ার এমন নজির আর কয়টা আছে?

আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটা ঘটনাও বেশ চমকপ্রদ।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পরের ঘটনা। মদিনার আকাশ-বাতাস সেদিন ধুলোতে ভরে গেছে। আশপাশের কিছু দেখতে পাওয়া ভারি মুশকিল। কেন যেন মাটিও কাঁপছে থরথর করে। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা খোঁজ লাগালেন কী হচ্ছে, কেন এমন হচ্ছে মদিনায়। তিনি শুনলেন আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু ৭ শ উট নিয়ে ফিরেছেন মদিনায়। সেজন্যই এত শোর।

আবদুর রহমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর নাম শুনে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মনে পড়ে গেল অনেক দিন আগে শোনা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি কথা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, তিনি দেখেছেন জান্নাতে আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু হামাগুড়ি দিয়ে চলছেন।

ধুলোর আঁধার পেরিয়ে কথাটা পৌঁছে গেল আবদুর রহমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর কানে। তিনি ছুটে এলেন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার বাড়িতে। তাকে সাক্ষী রেখে দান করে দিলেন সব উট—শুধুই আল্লাহর তরে।[২]

---

[১] *সহিহুল বুখারি*, শিরোনাম, হাদিস নং : ২৩৫১; *আল-ইস্তিআব*, কুরতুবি, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ১০৪০; *আল-বায়ান ওয়াত তাহসিল*, ইবনু রুশদ, খণ্ড : ১৭; পৃষ্ঠা : ৬১১; *আল-ওয়াফি বিল ওয়াফায়াত*, খণ্ড : ২০; পৃষ্ঠা : ২৯

[২] *মুসনাদু আহমাদ* : ২৪৮৪২; *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি : ২৬৪; *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৯৮; *মারিফাতুস সাহাবা*, আবু নুআইম : ৪৮৬; *মুসনাদুল বাযযার* : ৬৮৯৯; *মাজমাউয*

আপনার মধ্যে যদি দান-সাদাকার স্বভাব থাকে, তাহলে আপনি যত টাকাই উপার্জন করেন না কেন, উপার্জনের একটা নির্দিষ্ট অংশ আপনি দান করতে পারবেনই। মনে করুন, আপনার মাসিক আয় ৫০ হাজার টাকা। এখান থেকে প্রতি মাসে আপনি ৫ হাজার টাকা দান করে থাকেন। কোনোদিন যদি আপনি মাসে ৫ লাখ টাকা ইনকাম করতে পারেন, তখন আপনার পক্ষে ৫০ হাজার টাকা দান করাও কঠিন কিছু হবে না। কারণ দানসাদাকা আপনার অস্তিত্বের অংশ।

এখন ধরুন, যে লোক মাসে ১৫ হাজার কামিয়ে ১৫ টাকাও দান করে না, কোনোদিন সে দেড় লাখ উপার্জন করলে সেখান থেকে দেড় হাজার টাকা দান করতে পারবে কি না সন্দেহ। কারণ তার দান করার ইচ্ছা, আগ্রহ, অভ্যাস কোনোটাই নেই।

আসলে টাকাপয়সা নিয়ে আমাদের গৎবাঁধা চিন্তাই আমাদের আটকে রেখেছে সম্পদ কামানো থেকে। টাকাপয়সা নিয়ে আমাদের চিন্তা, আমাদের সম্পর্ক ভালো নয়। সেজন্য কামাই করতে এত অনীহা। এগুলো অবশ্য বংশ-পরম্পরায় পাওয়া।

যাওয়ায়িদ : ১৪৮৯২।—হাদিসটি বাতিল ও মুনকার (প্রত্যাখ্যাত)

ইমাম ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ এ হাদিসটি তার *আল-মাওযুআত* গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এ হাদিসটি মিথ্যা ও প্রত্যাখ্যাত।' এরপর ইমাম ইবনুল জাওযি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এ ধরনের মিথ্যা ও বাতিল হাদিস সাধারণত মূর্খ সুফিরা পছন্দ করে থাকে। তাদের ধারণা, ধনসম্পদ কল্যাণের পথে অগ্রগামিতার পথে বাধা। তারা এই বাতিল হাদিসের ওপর ভিত্তি করে বলে থাকে, যখন সম্পদের কারণে আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো সাহাবি হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তখন এটাই ধনসম্পদের নিন্দার জন্য যথেষ্ট। অথচ বাস্তবতা হলো, যে হাদিসের ওপর ভিত্তি করে তারা এমন কঠিন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, সে হাদিসটিই বিশুদ্ধ নয়। এটা হতেই পারে না যে, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ধনসম্পদ তার কল্যাণের পথে অগ্রগামিতায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। কারণ সম্পদ উপার্জন করা তো সম্পূর্ণরূপে বৈধ। এটা তখনই নিন্দনীয় হবে যখন সম্পদ অন্যায় ও অবৈধভাবে উপার্জন করা হবে এবং সম্পদের ওয়াজিব হক (যাকাত-ওশর) আদায় করা হবে না। আর আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাযিয়াল্লাহু আনহু এ উভয় সমস্যা থেকেই পুরোপুরি মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন। (আরেকজন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি) তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুর সময় তিনশ উট বোঝাই (৪০ মেট্রিক টন) স্বর্ণ রেখে যান। অনুরূপ (আরেকজন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি) যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য অনেক সাহাবিও প্রচুর ধনসম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। যদি তারা জানতেনই, এভাবে সম্পদ উপার্জন করা ও জমা করা নিন্দনীয় বিষয় তাহলে অবশ্যই তারা সব সম্পদ দান করে দিতেন। বস্তুত কিসসা-কাহিনি বর্ণনাকারী বক্তারা এ ধরনের বাতিল হাদিস খুব পছন্দ করে থাকে। তারা মানুষকে গরিব থাকতে উৎসাহিত করে আর ধনসম্পদ উপার্জন করাকে নিন্দার চোখে দেখে। সুতরাং মহান আল্লাহ কতই না মহান, যিনি আলিমদেরকে এমন যোগ্যতা দান করেছেন যে, তারা বিশুদ্ধ হাদিস চিনতে এবং দ্বীনের মূলনীতি বুঝতে সক্ষম। [*আল-মাওযুআত*, ইবনুল জাওযি, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৩২৭]—শারয়ি সম্পাদক

দেখা যাবে আপনার বাবা-মা হয়তো টাকাপয়সা নিয়ে আপনাকে এ ধরনের সবক দিয়েছেন। তারা আবার এরকম সবক পেয়েছেন তাদের বাবা-মায়ের কাছে।

সিক্রেটস অব দা মিলিয়নিয়ার মাইন্ড বইতে লেখক টি হার্ভ একার লিখেছেন, 'আপনি সম্ভবত শুনেছেন, এক বানর যা করে অন্য বানরও তা-ই করে। ছোটবেলায় আমরাও কিন্তু এরকম করেছি। এখন হয়তো অনেকে মানতে চাইব না কথাটা। কিন্তু কথাটি এক বিন্দুও মিথ্যে নয়।

একটা গল্প মনে পড়ল। এক গৃহিণী রাতের খাবার তৈরি করছেন। চুলোতে চড়ানোর আগে মাংস দুদিক থেকে কেটে বসিয়েছেন। তার স্বামী এমন কাণ্ড দেখে তো অবাক। তিনি জানতে চাইলেন এর কারণ কী। গৃহিণী বললেন, তিনি তার মাকে এভাবে কাটতে দেখেছেন। কোনো এক কারণে সেদিন গৃহিণীর মা এসেছিলেন রাতে তাদের সঙ্গে ডিনার করতে। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মাংস রান্নার সময় এভাবে কাটতেন কেন। মা বললেন, 'আমার মা এভাবেই রান্না করতেন।' রহস্য উদ্ধারে তারা দাদিকে ফোন দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন কেন তিনি এভাবে রান্না করতেন? তিনি বললেন, 'আমার কড়াই ছোট ছিল রে!'

'তো কথা হচ্ছে, টাকাপয়সার বেলাতে আমরাও হয় তো বাবা-মায়ের মধ্যে যেকোনো একজন বা দুজনের মতোই চিন্তা করি।'

বাবা-মায়ের হাত ধরে আমাদের মনে বিভিন্ন চিন্তা আসন গাড়ে। আমাদের বাবা-মা সেগুলো পেয়েছেন তাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে। এভাবে কোনো এক সময়ে কোনো এক বাবা কিংবা মায়ের ভাবনা ছিল টাকাপয়সা ভালো জিনিস নয়। সেই ধারণা ঢুকে জমে গেছে আমাদের মনের গভীরে। আর আজকাল মিডিয়া তাতে আরো বেশি হাওয়া দিচ্ছে।

☆☆☆

স্বীকার করি বা না করি, আমাদের প্রায় সবাই ভাবি টাকাপয়সা ভালো নয়। অর্থই অনর্থের মূল। মুখে না বললেও, আমাদের কাজেকর্মে ঠিকই বোঝা যায় আমাদের এই খতরনাক বিশ্বাস। যার মধ্যে আল্লাহর পুরস্কারের আশা নেই, যে আল্লাহর ইবাদত করতে চায় না, সে কেন আযান শুনলে সালাত পড়তে যাবে? সেরকমই অর্থকে যে অনিষ্টের মূল মনে করে, যতভাবে পারে সে দূরে থাকে টাকাপয়সা কামানোর চিন্তা থেকে।

সত্যি বলতে এই ধ্যানধারণা আমাদের মধ্যে ঢুকেছে খ্রিস্টধর্মের বিকৃত চিন্তা থেকে। আমাদের মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে এসব বিকৃত চিন্তা। টাকাপয়সা কখনোই সব অনিষ্টের মূল নয়। বরং টাকাপয়সার সদ্ব্যবহার আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণের হাতিয়ার।

টাকাপয়সা জমিয়ে হাড়কৃপণ হতে নিষেধ করে ইসলাম। কিন্তু ইসলাম কখনো এটা বলে না যে, টাকাপয়সা কামিয়ো না। বরং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায় এর ভিন্ন চিত্র ফুটে ওঠে—

‘ওপরের হাত (দাতার হাত) নিচের হাত (গ্রহীতার হাত) অপেক্ষা উত্তম। প্রথমে তাদেরকে দেবে, যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তুমি বহন করো। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সাদাকা করা সর্বোত্তম।[১]

যে ব্যক্তি (পাপ ও ভিক্ষা করা থেকে) পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী করে দেন।’[২]

হাদিসটিতে কী বলেছে বুঝেছেন তো? মুমিন-মুসলিমরা স্বচ্ছল তো হবেই—নইলে নিজের আর পরিবারের দরকার মেটাবে কী করে? সাথে দরকারের বেশি সম্পদও চাই দানখয়রাতের জন্য।

সম্পদ আমাদের মুক্ত করে আর্থিকভাবে। প্রতিদিনের ধরা-বাঁধা চাকরিতে আমাদের বন্দি রাখে না; বরং আমাদের মনের তামান্না পূরণের সামর্থ্য দেয়। আমরা তখন সবচেয়ে ভালোভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে পারি সবকিছুর চিন্তা থেকে ফারেগ হয়ে। আমরা কাজ করে যেতে পারি আমাদের জীবনের বড় বড় মাকসাদের পেছনে।

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১৪২৭; *সহিহ মুসলিম* : ১০৪২; *জামি তিরমিযি* : ৬৮০; *মুসনাদু আহমাদ* : ৪৪৭৪, ৭৮৬৭, ৮২৪৭, ১০১৫১, ১৫৩২৬, ১৫৫৭৮; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৩৩৬৩; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ৭৭৫২, ৭৮৬৫; *আস-সুনানুল কুবরা*, নাসায়ি : ৯১৬৬; *মুসনাদু আবি ইয়ালা* : ৫৭৩০; *মুসনাদুল বাযযার* : ১২০২, ১৭২৭, ১৯৪৪, ৮৮৯৪, ৯৬৪৪, ৯৭০৪; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ১০৬৯৩; *মুসনাদু ইসহাক ইবনু রাহ্ওয়াইহ* : ২৩৫।

[২] *সহিহুল বুখারি* : ১৪২৭, ১৪৬৯; *সহিহ মুসলিম* : ১০৫৩; *সুনানু আবি দাউদ* : ১৬৪৪; *জামি তিরমিযি* : ২০২৪; *মুসনাদু আহমাদ* : ১১০৯১, ১১৪৩৫, ১৫৩২৬, ১৫৫৭৮; *সুনানুদ দারিমি* : ১৬৮৬; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ৭৭৫২, ৭৮৬৬, ১৩২১০।

আর সেটাও এখনই এই মুহূর্তে।

অর্থের নিগড়ে বাঁধা লোকজন দুশ্চিন্তায় থাকে। ভাবে জীবনের অমুক লক্ষ্য পরে একসময় পুরো করবে, যখন বয়সটয়স হবে। কাজকর্ম থেকে অবসর নেবে তখন। অথচ অতদিন যে তারা বেঁচে থাকতে পারবে, তার নিশ্চয়তা কোথায় বলুন?

অনেকের মনে আরেকটা কুধারণা আছে। তারা মনে করেন সম্পদ কামাতে অনেক বেশি ঘাম ঝরাতে হবে। অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হবে। ব্যবসা করে সফল তো আর এমনি এমনি হয় না কেউ। মেহনত তারা করেনই। কিন্তু হিসেব করলে দেখবেন এই মেহনত চাকুরিজীবীদের থেকে কোনো অংশেই কম নয়। আমি বরং ব্যক্তিগতভাবে এমন অনেককে জানি, যারা চাকরির মতো অত ঘানি না টেনেও ব্যবসায় সফল হয়েছেন। তারা জানপ্রাণ দিয়ে মেহনত করেননি, তা বলছি না। চাকরিতে যেরকম মানুষ ঘানি টানে, তারা ব্যবসাতেও সেরকম মেহনত করেছেন। কষ্টের পরিমাণ যদি একই হয়, তাহলে এমন কিছু কেন করবেন না, যেখানে জীবন হবে বেশি অর্থবহ?

অনেকে মনে করেন বেশি টাকাপয়সা মানে বেশি দায়দায়িত্ব। কিন্তু বিষয়টা তো এমন নয় যে, আপনাকে বস্তা বস্তা টাকা বিছানার তলে রাখতে হচ্ছে? শুধু আপনার ব্যাংকের হিসেবেই সংখ্যা বাড়ছে—এই তো।[১] আপনাদের অনেকের কম্পিউটার বা মোবাইলে এমন কত ফাইল আছে, যেগুলোর পেছনে লেখা আছে লাখ লাখ লাইনের কোডিং। ওগুলোকে কি বোঝা মনে হয়?

সম্পদ নিয়ে আপনার মনে যেসব বিশ্বাস যেসব চিন্তা ধ্যানধারণা আছে, প্রায় সবই সম্ভবত ভুল। এগুলো নতুন করে ভাবা দরকার আপনার।

সম্পদ নিয়ে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা কী জানেন? প্রাচুর্য আর নিজেদের যোগ্যতা নিয়ে আমাদের ভুল ধারণা।

স্যান্ডউইচের উদাহরণটায় ফিরে যাই। কেউ কি কখনো নিজেকে শুধায়, আমি কি স্যান্ডউইচ বানাতে চাই কিংবা আমি কি স্যান্ডউইচ খাওয়ার যোগ্য?

টাকাপয়সা নিয়ে আপনার সব চিন্তাকে স্যান্ডউইচ দিয়ে বদলান দেখি।

---

[১] সুদ গ্রহণ না করে বিশেষ প্রয়োজনে এবং নিরাপত্তার খাতিরে ব্যাংকে টাকা রাখার অনুমতি রয়েছে।

'স্যান্ডউইচ' সব অনিষ্টের গোড়া। যেসব লোকের কাছে 'স্যান্ডউইচ' আছে শুধু তারাই আরো 'স্যান্ডউইচ' বানাতে পারে। যাদের 'স্যান্ডউইচ' আছে তারা আরো বেশি বানায়। যাদের নেই তাদের আর হয় না। আচানক আমার হাতে যদি অনেক 'স্যান্ডউইচ' চলে আসে আমি লোভী হয়ে যাব। হাড়কিপটে হয়ে যাব। আমি 'স্যান্ডউইচ' বানাতে পারছি না। একটা ত্রুটিও যে নেই। 'স্যান্ডউইচ' কীভাবে বানাতে হয় আমি জানি না। আমার মাথায় এত বুদ্ধিসুদ্ধি নেই।

আমার সবচেয়ে প্রিয় লাইন হচ্ছে এটা—আমি আসলে 'স্যান্ডউইচের' যোগ্য নই। 'স্যান্ডউইচ' বানানো কি চাট্টিখানি কথা। দিন নেই, রাত নেই আপনাকে কাজ করতে হবে। পরিবার আর বন্ধুবান্ধবের সাথে সময় কাটানো যাবে না মাস কে মাস, বছর কে বছর। এরপর গিয়ে না আপনি 'স্যান্ডউইচ' বানানো শিখবেন। হ্যাঁ, আল্লাহ অনেককে 'স্যান্ডউইচ' দিয়ে আশীর্বাদ-ধন্য করেছেন। কিন্তু আমাকে না। নিশ্চয় আমি কোনো পাপ করেছি। এজন্যই আল্লাহ আমাকে এর শাস্তি দিচ্ছেন। আমাকে বুঝতে দিচ্ছেন না কীভাবে 'স্যান্ডউইচ' বানাতে হয়।

লোকজন ভাবে তারা টাকাপয়সা কামানোর যোগ্যই না। টাকা কামানোর মতো যথেষ্ট হিম্মত তাদের মধ্যে নেই। তারা ভাবেন তাদের গরিবি হালতে রেখে আল্লাহ শাস্তি দিচ্ছেন। আচ্ছা বলুন তো, আপনার হাতে যদি স্যান্ডউইচ না থাকে এই মুহূর্তে, আপনি কি বলবেন, নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আযাব? নাকি আপনার হাতে স্যান্ডউইচ না থাকার কারণ স্যান্ডউইচের প্রতি আপনার অনীহা? আপনার যদি আগ্রহ থাকত, তাহলে তো অনন্ত উঠে গিয়ে স্যান্ডউইচটা নিজেই বানিয়ে নিতেন।

স্যান্ডউইচ বলুন আর অর্থকড়িই বলুন, আপনার হাতে ওটা নেই, কারণ আপনি আসলে ওটা পাওয়ার জন্য আন্তরিকতার সাথে কিছুই করেননি। এর বদলে আপনি তাকদিরের দোহাই দিচ্ছেন। আল্লাহকে দোষারোপ করছেন আযাবের কথা বলে। অথচ আল্লাহ আমাদের আদেশ করেছেন, তাঁর ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সুধারণা রাখতে। তাঁর কাছে সবচেয়ে সেরাটি আশা করতে। যখন এই কাজগুলো ঠিকঠাক করবেন, দেখতে পাবেন, আল্লাহ আপনার প্রত্যাশা তো পূরণ করছেনই, সেই সাথে তাঁর অসীম দয়া আর বদান্যতা-গুণে আপনার রিজিক আরো বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ

বলেছেন, 'আমি সে রকমই, যে রকম বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি বান্দার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে আমাকে স্মরণ করে মনে মনে; আমিও তাকে স্মরণ করি গোপনে (অর্থাৎ তাঁকে এমনভাবে সাওয়াব ও রহমত দান করি, যা কেউ জানে না)। আর যদি সে লোক-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমি তাকে তার চেয়েও উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়; আমি তার দিকে এক বাঁও[১] এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই (অর্থাৎ বান্দা আমার নৈকট্যলাভের জন্য যত দ্রুত চেষ্টা করে, আমি তারচেয়ে বেশি দ্রুত তাকে আমার ক্ষমা ও রহমত দান করি)।''[২]

আল্লাহ আমার কপালে অর্থসম্পদ লিখে রাখেননি কিংবা আর্থিক কষ্টে রেখে আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন, এসব বলে বলে আমরা আসলে নিজেদেরই ক্ষতি করি। আমরা নৈরাশ্যবাদী হই। তাঁর প্রতি বাজে ধারণা করি। আমাদের বরং চোখ ফেরানো চাই নিজের দিকে। সম্পদ থেকে বঞ্চিত থাকার এই ইচ্ছে কি আমার নিজের? আমিই কি আমাকে ইচ্ছে করে এভাবে বঞ্চিত রাখছি? মানুষের এই দ্বৈত স্বভাব নিয়ে ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ কী বলেছেন দেখুন—

'আল্লাহ যাদের (মিথ্যা ধারণা থেকে) হিফাযত করেছেন তো করেছেন। নইলে এরা বাদে বেশিরভাগ লোক ধারণা করলে মিথ্যেটাই করে। চিন্তা করলে খারাপটাই চিন্তা করে। বেশিরভাগ লোক বিশ্বাস করে, তাদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। তাদের প্রাপ্য অংশ থেকে কম দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাদের যা দিয়েছেন, এরচেয়ে বেশি তাদের প্রাপ্য। তারা যেন বলতে চায়, 'আমার রব আমার সাথে জুলুম করেছেন। আমার যা পাবার অধিকার আছে, তিনি আমাকে তা দেননি।' মনে মনে তার চিন্তা এই; যদিও মুখে তা বলে না। খোলাখুলি এসব বলতে চায় না। নিজ মন খুঁড়ে যারা এর নাড়িনক্ষত্র তালাশ করবে, তারা তাদের মনের এসব চিন্তা জ্বলন্ত আগুনের মতো স্পষ্ট দেখতে পারবে...।

---

[১] এক বাঁও হচ্ছে প্রসারিত দুই বাহুর সমপরিমাণ দূরত্ব।

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৭৪০৫; *সহিহ মুসলিম* : ২৬৭৫; *জামি তিরমিযি* : ৩৬০৩; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৮২২; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৮১১; *মুসনাদু আহমাদ* : ৭৪২২, ৯৩৫১, ১০২২৪, ১০২৫৩, ১০৭৮২, ১০৯০৯; *শুআবুল ঈমান* : ৫৪৬; *আস-সুনানুল কুবরা*, নাসায়ি : ৭৬৮৩।

'অন্যের মন খুঁড়ে দেখার সুযোগ পেলে দেখতেন, তারা কী রকম কপালের দোষ দেয়। যা হয়েছে তার বদলে তারা অন্য কিছু চায়। সবসময় চায় অমুক জিনিসটা এভাবে না হয়ে যদি ওভাবে হতো...।

'আপনি আপনার নিজের মন খুঁড়ে দেখুন। আপনি কি এরকম চিন্তা থেকে মুক্ত? যদি মুক্ত থাকেন, তাহলে বড় বাঁচা বেঁচেছেন। নইলে আপনার নিস্তার পাবার কোনো পথ দেখছি না।'[১]

টাকাপয়সা নিয়ে আমাদের আরেকটা কুসংস্কার কী—আমরা ভাবি তুখোড় বুদ্ধিমান না হলে পয়সা কামানো সম্ভব না। আচ্ছা একটা স্যান্ডউইচ বানাতে কতখানি বুদ্ধি থাকতে হয়? খুব বেশি লাগে?

মোটেও না।

অনেকে ভাবেন, ভাগ্য ভালো না হলে ব্যবসা করা যায় না। আমাকে বলুন তো, একটা স্যান্ডউইচ বানাতে ভাগ্য কতখানি লাগে? আপনি স্যান্ডউইচ খেতে চান, ব্যস। এবার আপনাকে উঠে বানিয়ে বা কিনে খেতে হবে—এই তো।

টাকাপয়সার বিষয়টা এরচেয়ে খুব বেশি আলাদা কিছু নয়। পয়সা আর দশটা জিনিসের মতোই একটা জিনিস। এখানে আলাদা কোনো নিয়মকানুন নেই।

কাগজে টিভিতে আমরা শুনে শুনে বড় হয়েছি পয়সাওয়ালা লোকেরা একেকজন কত বড় 'নায়ক'। কত ঘাম ঝরিয়ে আজ তাদের এই অবস্থায় আসতে হয়েছে! আমাদের মধ্যে এমন লাখ লাখ মানুষ আছেন, যারা গরিবদের বেশি ধার্মিক ভাবেন। অনেকে তো বরং ইচ্ছে করে গরিব থাকার বিলাসী চিন্তা করেন।[২] 'নিচের হাতের

---

[১] *যাদুল মাআদ*, ইবনুল কাইয়িম, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ২১১

[২] একটি হাদিসে এসেছে—আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে মিসকিন অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখুন, মিসকিন অবস্থায় মৃত্যু দান করুন এবং কিয়ামত দিবসে মিসকিনদের দলভুক্ত করে হাশর করুন।' [*জামি তিরমিযি* : ২৩৫২]

এ হাদিস দ্বারা অনেকে দরিদ্রতার পক্ষে দলিল পেশ করেন। তারা মনে করেন, এ হাদিসে দরিদ্র হওয়ার জন্য দুআ করা হয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে অর্থসম্পদ থাকা ভালো বা কল্যাণকর কিছু নয়। তাই সর্বদা দরিদ্র থাকার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। প্রথমত, এ হাদিসটি দুর্বল। ইমাম ইবনুল জাওযি, ইমাম নববি, ইমাম ইবনু তাইমিয়া, ইমাম ইবনু কাসির, হাফিয ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ

চেয়ে ওপরের হাত ভালো'—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই কথাটা মনে আছে তো? যাদের পয়সাকড়ি কম, বাহ্যিক চোখে এরাই কিন্তু হাদিসে বলা 'নিচের হাত'।[১]

হাদিসবিশারদ এ হাদিসটিকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। [*আল-মাওযুআত*, ইবনুল জাওযি, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ১৪২; *আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব*, নববি : খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৯৬; *মাজমুউল ফাতাওয়া*, ইবনু তাইমিয়া : খণ্ড : ১৮, পৃষ্ঠা : ৩৫৭; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ইবনু কাসির : খণ্ড : ৬পৃষ্ঠা : ৭৫; *আত-তালখিসুল হাবির*, ইবনু হাজার : খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১০৯]

দ্বিতীয়ত, যদি হাদিসটি সহিহ বলে মেনেও নেওয়া হয়, তাহলে আমরা এটার ব্যাখ্যায় বলব, এখানে 'মিসকিন' বলতে অর্থসম্পদহীন দরিদ্র বোঝানো হয়নি; বরং বিনয়ী ও নিরহংকারী হওয়া বোঝানো হয়েছে। ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন—'তিরমিযির বর্ণিত এ হাদিসটি সহিহ হোক বা না হোক, এখানে যে মিসকিনের প্রশংসা করা হয়েছে সে প্রশংসিত মিসকিন হলো বিনয়ী ও নিরহংকারী ব্যক্তি। এখানে মিসকিন শব্দটির দ্বারা দারিদ্র্য উদ্দেশ্য নয়; বরং কখনো তো এমনও হয় যে, একজন মানুষ আর্থিকভাবে দরিদ্র কিন্তু অহংকারী। যেমন : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সহিহ হাদিসে বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি রহমতের নজরে তাকাবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না, আর তাদের জন্য প্রস্তুত থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এক. মিথ্যুক বাদশাহ, দুই. অহংকারী দরিদ্র, তিন. যিনাকারী বৃদ্ধ।... সুতরাং মিসকিন হওয়া অন্তরের একটি বিষয়। আর সেটা হলো, অহংকারের বিপরীতে বিনয়ী ও বিনম্র হওয়া। [*মাজমুউল ফাতাওয়া*, ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ১৮; পৃষ্ঠা : ৩২৬]

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানি ইমাম বাইহাকির বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, 'এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন মিসকিন হওয়ার দুআ করেননি, যার অর্থ দরিদ্র হওয়া; বরং তিনি প্রার্থনা করেছেন এমন মিসকিন হওয়ার জন্য, যার অর্থ বিনয় ও নম্রতা। [*আত-তালখিসুল হাবির*, ইবনু হাজার, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ১০৯] আভিধানিক অর্থও এটার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইমাম ইবনু মানযুর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আভিধানিকভাবে 'মিসকিন' শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে বিনয়ী, নিরহংকারী। আর 'ফকির' শব্দের মূল অর্থ—মুখাপেক্ষী। এজন্যই হাদিসে এসেছে : 'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে মিসকিন অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখুন।' এখানে 'মিসকিন হওয়া' দ্বারা তিনি বিনয়ী, নম্র ও নিরহংকারী হওয়া বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ হে আমার রব, আপনি আমাকে আপনার সামনে বিনীত, দুর্বল ও নিরহংকারী অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখুন। এখানে 'মিসকিন' বলতে দরিদ্র ও মুখাপেক্ষী বোঝানো হয়নি।' [*লিসানুল আরব*, ইবনু মানযুর, খণ্ড : ১৩; পৃষ্ঠা : ২১৬]—শারয়ি সম্পাদক

[১] অর্থসম্পদ বা পয়সাকড়ি না থাকলেই যে সর্বদা তার হাত নিচে থাকে, ব্যাপারটা এমন নয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটে থাকে। এজন্য বইয়ে কথাটির সাথে 'বাহ্যিক চোখে' শব্দ যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণত যাদের তেমন অর্থ-সম্পদ থাকে না, তারা তেমন দান-সাদাকাও করতে পারে না; বরং মানুষের কাছ থেকে দয়াদাক্ষিণ্য গ্রহণ করে। হ্যাঁ, এমন মানুষের কথাও অস্বীকার করা হচ্ছে না, যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় দান-সাদাকা করে। তাদের হাত সর্বদা ওপরে থাকে, কখনো নিচে থাকে না। তবে এদের সংখ্যা একেবারেই কম, হাতে-গোনা। তাই বৈধভাবে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও হালাল উপার্জন থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। কারণ দরিদ্র হয়ে ঘরে বসে থাকার চেয়ে হালালভাবে উপার্জন করে দান-সাদাকা করা অনেক বেশি উত্তম।—শারয়ি সম্পাদক

শুরুতে টাকা না থাকলে টাকা হবে না—এটা হলো আরেকটা কুসংস্কার।

শুনুন ভাই, যে কিনা ১০ টাকাকে ১০০ টাকা বানাতে পারে না, সে লাখ টাকাকেও কোটি টাকা বানাতে পারবে না। ডোনাল্ড ট্রাম্পকেই দেখুন না।

গবেষকেরা দেখেছেন, যেবার মূল্যস্ফীতির কারণে ডলারের মান সমন্বয় করা হলো, ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি ৭০ দশক থেকে বিনিয়োগ না করতেন, তবে তিনি এখন যত ধনী, তারচেয়ে আরো বেশি ধনী হতেন। ট্রাম্প জীবনের জায়গায় জায়গায় বহু টাকা খুইয়েছেন। অনেকের চেয়ে অনেক বেশি টাকা নিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন, সেটা সত্য। কিন্তু পয়সা বাড়ানোয় তিনি খুব একটা দক্ষ নন।

শুরুতেই মোটা অঙ্ক নিয়ে যারা শুরু করেন, তাদের সুবিধা একটা। দ্রুত তাদের টাকা বানানোর সম্ভাবনা বাড়ে। এটা সহজ গণিত, তাই না? শুরুতে বেশি টাকা নিয়ে শুরু করলে, লাভ হলে সব মিলে আপনার সম্পদের পরিমাণ বাড়বে। সুতরাং কত দিয়ে শুরু করলেন কিংবা আদৌ কিছু দিয়ে শুরু করলেন কি না, সেটা মূল কথা নয়। আপনি শুরুর সংখ্যাকে কত বাড়াতে পারছেন সেটাই আসল।

ধরুন, একজন লোক ১০ লিটার তেলের ট্যাংকি ভরতে পারেন। এখন তাকে দিয়ে ১০০ লিটার বা ১ হাজার লিটার তেলের ট্যাংকি ভরাতে হলে তাকে কি আরো বেশি দক্ষ হতে হবে? শুধু পরিমাণেরই তো যা পার্থক্য। কেউ যদি বলে এতদিন ৫০ লিটারের ট্যাংকি ভরেছি, এজন্য ১ হাজার লিটারের ট্যাংকি ভরতে পারব না, ট্যাংকির আকার বড়, আমি জানি না এত বড় ট্যাংকি কীভাবে ভরব, এই লোকের আসল সমস্যা আসলে কোথায়? তেলের নজেলটা তাকে আগের চেয়ে বেশি সময় ধরে রাখতে হবে। এছাড়া আর কী? বড় ট্যাংকি ভরতে তার এমন কী বিশেষ দক্ষতা, বুদ্ধি বা কপাল লাগবে বলুন দেখি?

একটা কথা কী জানেন? অনেক বিত্তবান লোকের কিন্তু লাভের চেয়ে লস বেশি। কত বড় বড় ফুটবল তারকা কিংবা অন্য জগতের তারকারা—শুনবেন হঠাৎ করে তারা দেউলিয়া। এরা শুধু খরচ করতে শিখেছে; আয় করতে না।

যারা সুযোগটা হাতে নিতে চান না, তারা যেন বলছেন, 'ওইসব লোকেরাই তো সব স্যান্ডউইচ নিয়ে বসে আছে। আল্লাহ তাদের কপাল খুলে দিয়েছেন। ওরা এই, ওরা সেই। কিন্তু আমি পারব না, বাবা!'

মানে, আপনার সামনেই একটা দোকানে স্যান্ডউইচ বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু আপনি বারবার নিজেকে শোনাচ্ছেন, না রে, আমি পারব না। আমার এত ক্ষমতা নেই। নিজেকে যদি এসব কথাই বলতে থাকেন, তাহলে আপনি আপনার এক জগৎ তৈরি করে ফেলবেন। সত্যি, আপনার পক্ষে আর স্যান্ডউইচ জোটানো সম্ভব না।

যদি মনে হয় টাকা কামানো মেলা কঠিন কাজ, যদি মনে হয়, যারা সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মায়, টাকাপয়সা শুধু তাদের জন্যই, শুধু এই কথার জবাব দিন—স্যান্ডউইচ বানানো কি খুব কঠিন?

যদি উত্তর হয়, সোজা, তাহলে মনে রাখবেন, টাকা কামানোটাও সোজা।

যদি বলেন, 'জিনিসপাতি কিনতে তো চাই, কিন্তু আমার কাছে তো এখন টাকা নেই।' আচ্ছা, আপনার ঘরে যদি স্যান্ডউইচ বানানোর রুটি না থাকে কী করবেন? দোকান থেকে রুটি কিনে আনবেন, তাই তো?

দুনিয়াতে যেমন রুটির অভাব নেই, টাকাপয়সারও কোনো কমতি নেই।

টাকাপয়সা নিয়ে আপনার মনে যত কুকথা, সেটা স্যান্ডউইচ দিয়ে পাল্টে ভাবুন। কথাগুলোর কোনো মানে হয়? স্যান্ডউইচের বেলায় যদি কোনো মানে না থাকে, তাহলে জেনে রাখুন, টাকাপয়সার বেলাতেও এমন আকথার কোনো মানে নেই।

দ্বীনপ্রচারের সেরা মাধ্যম

[ব্যবসা-বাণিজ্যে সুন্নাহর চর্চা]

> আল্লাহকে আরাধনার ব্যবসা করুন। দেখবেন কোনো পুঁজি ছাড়াই সব জায়গা থেকে লাভ কীভাবে আসে!—মালিক ইবনু দিনার রাহিমাহুল্লাহ

একদিন এক ক্লায়েন্টের কাছে যাচ্ছি। যেতে যেতে কেন যেন মনে হচ্ছিল আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট তার মনে থাকবে তো?

আমার এই ক্লায়েন্ট আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তাকে আঙ্কেল বলে ডাকি আমি।

তো, এই আঙ্কেলের একটা রেস্তোরাঁ আছে মুসলিমপাড়ায়। এক দাতব্য সংস্থার কাজের সূত্রে আমরা বেশ কয়েকবার বসেছি আলাপসালাপ করতে। দাতব্য সংস্থার মিটিংগুলোতে তিনি নিজের রেস্তোরাঁ থেকে খাবারের ব্যবস্থা করতেন বিনামূল্যে। কোনো বিনিময়ের আশা রাখতেন না।

যা হোক, কথায় কথায় একবার তিনি বলেছিলেন, নিজের ব্যবসাটা এগিয়ে নিতে চান তিনি। আমি পরে একদিন তাকে ফোন দিয়ে বললাম, কবে দেখা করতে পারি? ব্যবসা এগিয়ে যাওয়া নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করব। বললাম, আপনার ব্যবসা সম্বন্ধে জেনে নিয়ে ইনশাআল্লাহ পরামর্শ দিতে পারব।

ফোন রেখে দেবার আগে তাকে বললাম, আঙ্কেল, দেখা করার দিনতারিখটা একটু কষ্ট করে ডায়েরিতে লিখে রাখবেন প্লিজ।

ধার্য করা দিনে গেলাম আঙ্কেলের সাথে কথা বলতে। গাড়ি পার্ক করে খুঁজতে লাগলাম আঙ্কেলের অফিস। দেখি জায়গায় জায়গায় ময়লার ঝুড়ি। সবকটাতেই ময়লা উপচে পড়ছে। দেখলাম গাড়িগুলো একেকটা একেকভাবে রাখা। আর জায়গায় জায়গায় খানাখন্দ। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারলাম, খুব সম্ভবত তিনি ভুলে গেছেন আমাদের আজকের দেখা করার কথা।

এর আগে যত মুসলিম ব্যবসায়ীর সঙ্গে কাজ করেছি, দেখেছি, তারা হয় একেবারে ভুলে যান এ ধরনের মিটিংয়ের কথা। অথবা মনে থাকলেও ধার্য করা দিনে কোনো সমস্যা থাকলে পরে যে জানাবেন, তা করেন না। এরকম করে করে কতদিন যে আমার কত সময় বরবাদ হয়েছে!

কোনো কোনো সমাজে অন্যের সময়ের যেন কোনো দাম নেই।

কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার, অফিসে ঢুকে দেখি, আঙ্কেল আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। এক কাবলি সেটের ওপরে ফরমাল ব্লেজার পরেছেন। চিরাচরিত ব্যবসায়ীদের পোশাক না যদিও, কিন্তু তার জন্য ঠিক আছে।

১২ বছর ধরে আঙ্কেল এই রেস্তোরাঁ চালাচ্ছেন। কিছুদিন আগে থেকে রেস্তোরাঁয় বসে খাওয়ার পাশাপাশি পার্সেলের ব্যবস্থাও চালু করেছেন। আমি অভিনন্দন জানালাম আঙ্কেলকে তার সাফল্যে।

ব্যবসা বড় করতে কী দরকার, আমি তা জানি। তবে আঙ্কেলের ব্যবসার রহস্য জানতে কেমন যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলাম।

আমরা ব্যবসার সম্ভাবনা নিয়ে আলাপ করছিলাম। আঙ্কেল জানালেন, তিনি আর তার পার্টনার সামনে কী কী পরিকল্পনা করছেন।

আমি জানতে চাইলাম, তিনি কী ধরনের কর্মী নিয়োগ দেন। তাদের কীভাবে কাজকর্ম শেখান।

আঙ্কেল বললেন, তিনি সব কর্মীকে বলে দেন, কাস্টমার শুধু কাস্টমার না; তারা

মেহমান। ইসলামে মেহমানদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক, তিনি কর্মীদের মনে এই ধারণা পুরে দিয়েছেন।

মনে হলো, আমি যেন তার ব্যবসার রহস্য ধরে ফেলেছি। তিনি আসলে নবিজির সুন্নাহ চর্চা করেছেন ব্যবসায়। আর তাতেই কত বারাকাহ!

তিনি কর্মীদের বলে দিয়েছেন, কখনো যেন কাস্টমার কম না পান কোনো অর্ডারে। ৫টা বললে ৫টাই। কখনো যদি ৬টা চলে যায় ভুলে, যাক। টাকার ক্ষতি হোক। কিন্তু কম দিয়ে তিনি ব্যবসায়ের বারাকাহ হারাতে চান না। তিনি বলেছেন, সবাইকেই আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে। আপনাকে, আমাকে, আমাদের সবাইকেই দাঁড়াতে হবে একদিন আল্লাহ তাআলার সামনে। কোনো কাস্টমারের সঙ্গে ভুল করে সেটার জন্য তিনি হাশরের ময়দানে মাশুল দিতে চান না।

কী অসাধারণ মূল্যবোধ আঙ্কেলের!

তার আচরণে আমার আরেক ক্লায়েন্টের কথা মনে পড়ল। একবার কনসাল্টিং শেষে তাকে বিল পাঠিয়েছি। তিনি ফোন করে জানালেন, কীভাবে নেব? যদি ব্যাংকে নিই, তাহলে আজ হবে না। কাল সকালে পাবে। কারণ ব্যাংকের কর্মঘণ্টা ততক্ষণে শেষ হয়ে গিয়েছিল। নইলে আমি চাইলে ক্যাশ নিতে পারি । তার কাছে নগদ ক্যাশ আছে। অথবা যদি আরো দ্রুত চাই, তিনি কোনো ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন বললেন।

আমি বেশ অবাক হলাম। তিনি যেন সেই হাদিসটির বাস্তব উদাহরণ, যেখানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, ‘ঘাম শুকানোর আগে শ্রমিকের মজুরি দিয়ে দাও।’[১] সম্মানী পরিশোধে ভাইটির এই আন্তরিকতা, এমনকি প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত শোধ করতে তার যে আগ্রহ—আমি সত্যি ভীষণ অবাক হয়েছিলাম। তার এমন কাজে একজন মুসলিম হিসেবে আমার যদি এত ভালো লাগে, চিন্তা করতে পারেন, অমুসলিমদের কেমন লাগবে?

---

[১] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২৪৪৩; *শারহু মুশকিলিল আসার*, তাহাবি : ৩০১৪; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ১১৬৫৪; *আল-মুজামুস সগির*, তাবারানি : ৩৪; *মুসনাদু আবি ইয়ালা* : ৬৬৮২; *মুসনাদুশ শিহাব* : ৭৪৪; *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, খণ্ড : ৭; পৃষ্ঠা : ১৪২—হাদিসটি হাসান।

আরেকটি কাহিনি শুনুন।

কারা গ্রেইস ডুগান নামে এক ভদ্রমহিলা তার মায়ের জন্য জুস বানানোর মেশিন কিনবেন। মায়ের ক্যান্সার। ক্ল্যাসিফায়েড বিজ্ঞাপনের এক সাইটে খুঁজে পেলেন একটি মেশিন। বিক্রেতা যখন শুনলেন ক্রেতার মায়ের ক্যান্সার, তখন তিনি ডুগানকে এমনি এমনিই মেশিনটা দিয়ে দিতে চাইলেন।

লোকটির কথায় ডুগান খুশি হলেন। কিন্তু বললেন যে, তিনি বিনামূল্যে নেবেন না। মজার ব্যাপার—কিছুক্ষণ পর দেখলেন মোবাইলে একটি মেসেজ এসেছে। কে যেন তার বাড়ির ঠিকানায় একটা নতুন ব্লেন্ডার মেশিন পাঠাচ্ছে।

বুঝতে বাকি রইল না কাজটি কে করেছেন।

'সদয় লোকটি'র এই কাজ ডুগানের হৃদয় ছুঁয়ে গেল। তিনি ফেইসবুকে শেয়ার করলেন এই কাহিনি। খবরটা অনলাইনে এত বেশি ভাইরাল হয়ে গেল যে, একটি জাতীয় দৈনিকে পর্যন্ত খবরটি চলে এসেছে।

সেই লোকটির আতাপাতা কিছুই জানা যায়নি। তবে আমি অবাক হব না, সেই লোকটি যদি মুসলিম হন। অন্তত তার পাঠানো ক্ষুদে বার্তায় ইংরেজির ধরন দেখে বোঝা যায় ইংরেজি তার মাতৃভাষা না (অভিবাসী মুসলিম হবার সম্ভাবনা আছে)। সাধারণত মুসলিমদের মধ্যে এরকম দয়াপরবশ কাজের প্রচুর নজির আছে পৃথিবীর বুকে। আচার-আচরণেও মুসলিমরা অনন্য। জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষটি যে আমাদের আদর্শ।

মাত্র একজন লোকের এমন দয়াপরবশ আচরণের কী প্রভাব দেখলেন তো? পৃথিবীর কোণে কোণে যদি এরকম করে বহু মুসলিম এমন হৃদয়ছোঁয়া আচরণ করতেন, সারা দুনিয়ায় তাহলে কী প্রভাব পড়ত ভাবতে পারেন?

আজকাল অনেক মুসলিম মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিদিন অমুসলিমদের সাথে লেনদেন বা কাজ করতে হয়। এগুলো কিন্তু সুযোগ আমাদের জন্য। মুসলিমদের চারিত্রিক সৌন্দর্য প্রমাণের সুযোগ। আজকাল বাজারে যে পরিমাণ প্রতিযোগিতা, তাতে সুন্দর আচরণ ব্যবসায় বারাকাহ আনবে। সাহায্য করবে সামনে এগিয়ে যেতে।

ভোক্তাদের সামনে এখন অনেক বিকল্প। সেজন্য বাজারে এখন আপনার পণ্য থাকাই যথেষ্ট নয়। ভোক্তারা খোঁজেন উত্তম গ্রাহকসেবা।

উন্নত গ্রাহকসেবা দিয়ে আমরা নিজেদের আলাদা করতে পারি অন্যদের থেকে। আমাদের হাতে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্দান্ত, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারিত্রিক আদর্শ। আল্লাহ তার ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। লাখো হাদিসে মজুত আছে নবিজির কথা, তার কাজ, তার শিক্ষা। এখন যদি এগুলো কাজে না লাগাই তো আর কবে? এগুলো কাজে লাগালে দুনিয়াতে সাফল্য আসবে। পরকালেও আমাদের জন্য মুক্তির অসিলা হয়ে দাঁড়াবে। তবে আর কীসের জন্য অপেক্ষা?

আমরা আমাদের ব্যবসার সৌন্দর্য দ্বারা অমুসলিমদের কাছে ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য তুলে ধরতে পারি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মায়া-মমতা প্রতিটি জিনিসকে সুন্দর করে তোলে। আর মায়া-মমতা না থাকলে তা কুৎসিত হয়ে ওঠে।'[১]

আজ যদি মুসলিম মালিকানাধীন ব্যবসাগুলো ঠিক করে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই সুন্নাহর চর্চা করে, তাহলে সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন অমুসলিমরা নিজ মুখে বলবে, মুসলিমদের আচার-আচরণ সবচেয়ে সুন্দর। মিডিয়ায় মুসলিমদের নিয়ে যে 'কুৎসিত' প্রচারণা, সেটা উঠে যেতে সময় লাগবে না। আমরা (একটা লেভেল পর্যন্ত) ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে পারব শুধু নিজেদের মধ্যে নবিজির সুন্নাহ চর্চা করার মাধ্যমেই। আর আমাদের কর্মলিপিতে ভালো কাজের ওজন তো বাড়বেই দিন দিন।

সাহাবিরা কোথাও নয়া শহর চালু করলে, দুটো কাজ করতেনই করতেন। প্রথমে সেখানে মসজিদ বানাতেন একটা। আর বসাতেন বাজার।

আজ আমরা পৃথিবীর কোণে কোণে ছড়িয়ে গেছি। যেখানেই গিয়েছি, বানিয়েছি একটি মসজিদ। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের দুয়ার খুলিনি সবখানে। আমাদের ব্যবসাকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেবার সুযোগটা আমরা নিইনি। আধ্যাত্মিক আর বাণিজ্যিক

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২৫৯৪; *সহিহ আত-তারগিব ওয়াত তারহিব* : ২৬৬৪; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ৫০৬৮; *রিয়াযুস সালিহিন* : ২০৭; *আল-ইতিসাম লিশ শাতিবি*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ২৯৫

বলয়ের শীর্ষে থাকতে দরকার সততা আর সুন্দর চরিত্রের সমাবেশ। কিন্তু সেগুলো থাকার পরও আমরা সেই বার্তা পৌঁছে দিতে পারিনি বাকি দুনিয়ায়।

আজকাল ব্যবসা দ্রুত জনমানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। যত দিন যাবে তত সেই সময় আরো কমবে। একসময় মানুষের কাছে আপনার ব্যবসার খবর পৌঁছানোর মাধ্যম ছিল টিভি। হয়তো ৫-১০ বছর লেগে যেত দেশের সবার কানে আপনার ব্যবসার খবর যেতে। ফেইসবুকের কারণে এখন লাগে অর্ধেক সময়। স্ন্যাপচ্যাট যেন সেটা করে দেয় মাত্র কয়েক মাসে।

কলেজ স্টুডেন্টদের নিজেদের মধ্যে বাতচিতের জন্য শুরু হয়েছিল ফেইসবুক। আর এখন কে জানে না এর কথা। আজ কোটি কোটি মানুষ নিজের জীবন আর অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এখানে প্রতি মিনিটে। আধুনিক কাঠামো যে ব্যবসাকে সহজ করেছে এটা তার এক নজির। তবে অবশ্যই এটা শুধু প্রযুক্তিগত জিনিসে সীমাবদ্ধ নয়।

ফোর্ড গাড়ির কোম্পানির মালিক হেনরি ফোর্ডের স্বপ্ন ছিল সারা দুনিয়া হবে গাড়ির। কেবল নিজের দেশে নয়; তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন এই স্বপ্ন পৃথিবীর সবখানে। সাথে ছড়িয়ে দিয়েছেন তার পুঁজিবাদী মনও। এখন পৃথিবীর কোন দেশ আছে যেখানে কোনো না কোনো ধরনের গাড়ি বা যানবাহন তৈরির কারখানা নেই? কর্মীনিয়োগ, বেতন আর শ্রমের ব্যাপারে তার রপ্তানি করা পুঁজিবাদী মনেও এখন সয়লাব দেশের পর দেশ।

একসময় কত মুসলিম ব্যবসায়ী পৃথিবীর কত দিকে ছুটেছেন! ইন্দোনেশিয়ার কথাই ধরুন। কেন ওখানে মুসলিমদের সংখ্যা বেশি সেটা বুঝতে নজর দিতে হবে ইতিহাসে। ওখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে মুসলিমরা আসতেন বাণিজ্য করতে। সাথে আসত তাদের চিন্তাচেতনা, তাদের অনুপম চরিত্র। এগুলোই দাওয়াত হয়ে ছড়িয়ে যেত মানুষদের মাঝে। মানুষ জানত আল্লাহর একত্বের কথা। সুন্দর চরিত্রের কথা। আর জানত পৃথিবীতে শান্তি আর সুবিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব।

মুসলিম বণিকদের চারিত্রিক মূর্ছনায় আবিষ্ট হতো স্থানীয়রা। এসব বণিকেরা দাম নিয়ে প্রতারণা করতেন না। তাদের মধ্যে লোভ কাজ করত না। তারা চুক্তির সম্মান করত। অনেক উদার ছিলেন তারা। সম্পদ আর কামাই-রোজগার নিয়ে তাদের কপালে অত ভাঁজ পড়ত না। কারণ তারা বিশ্বাস করতেন সব রিজিক সব খোরাকি তো আল্লাহর কাছে। তাদের সঙ্গে যারা কাজ করত, তারা তাদের দাস মনে

করতেন না। তারা তাদের মনে করতেন সহকর্মী।

এদের সঙ্গে লেনদেন করতে গিয়ে স্থানীয়রা ভাবতে বসত নিজেদের অবস্থা নিয়ে। তারা ভাবত, এরা ব্যবসা-বাণিজ্যে যদি এমন হয়, জীবনযাত্রায় তারা না জানি কেমন। তাদের সদাচার আর সততা স্থানীয়দের মন খুলে দিত। তারা বুঝত, অন্য ধর্মগুলোর মতো না ইসলাম। এটা অনেক ব্যাপক। এর কারবার কেবল ইবাদত-বন্দেগি নয়।

ইসলামের সৌন্দর্য দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে ব্যবসার মতো যুৎসই বিকল্প নেই। আমাদের ব্যবসার মান যত ভালো হবে, সমাজে আমাদের প্রভাবও পড়বে সেই হারে। ব্যবসা করে ব্যক্তিগত অনেক অর্জন হয়তো হবে। তবে দিনশেষে আসল মর্যাদা কিন্তু অন্যখানে। সেটা হলো সমাজে আমাদের ইতিবাচক অবদান রাখা আর দুনিয়াকে উন্নত করায় আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।

আমাদের ব্যবসা যত ভালো হবে, সমাজে আমাদের প্রভাব হবে তত ভালো।

কালের আবর্তনে

[অতীত থেকে ভবিষ্যৎ]

> সংকটকাল অনেকটা গবেষণাগারের মতো কাজ করে। ওখানে সুপ্ত থাকে ভবিষ্যৎ-সমাধান। সংকট থেকেই এসেছে কৃষি আর শিল্পবিপ্লব, প্রযুক্তি আর কর্মচুক্তি, জীবাণুনাশক আর অ্যান্টিবায়োটিক। সংকট শুরু হলে অতীত আর বিশ্বস্ত ভবিষ্যদ্বক্তা থাকে না। জন্ম নেয় এক নতুন পৃথিবী।—ইয়ানিস ভারোফাকিস

পৃথিবীর শুরুতে ছিল বলবান মানুষদের একচেটিয়া আধিপত্য। যাদের শারীরিক শক্তি ছিল তারাই শুধু জয়ী হতো। সমাজে তাদের থাকত প্রতিপত্তি। আলাদা মর্যাদা। যে যত দ্রুত দৌড়াতে পারত, গায়ে জোর যত বেশি ছিল, শিকার ভালো করতে পারত, অন্যের ওপর জোর খাটাতে পারত, সেই ছিল সর্দার। তার ভাগাড়ে থাকত অনেক খাবার। দুর্বলেরা হাত পাতত তার দরবারে।

এরপর এলো শ্রমিকযুগ। তখন যার হাতে যত লোক, সেই তত শক্তিমান। সেই যুগ ছিল ফিরআউনদের, রোমানদের, পারসিকদের—বিশাল বিশাল লোক-লস্কর-সমেত বাহিনীদের।

এরপর এলো শিল্পযুগ। লোকবল নয়, এখন চাই শিল্পবল। তথ্য প্রচারের সুবিধা নিতে হাতে যাদের উন্নত যন্ত্রপাতি, উন্নত প্রক্রিয়া যাদের হস্তগত, তারাই এই সময়ের হর্তাকর্তা। মুসলিম জমিনে নেপোলিয়ন এসে দ্রুত তথ্য প্রচার করেছিল

ছাপাখানার বদৌলতে। সে তার জ্ঞানের নিজস্ব সংস্করণ উন্নতভাবে দ্রুত বাকিদের কাছে ছড়িয়ে দিয়েছিল। সেজন্য বাড়তি সুবিধা পেয়েছিল সে আর তার সহযোগীরা। এভাবেই পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের শুরু। একসময় তাদের শিল্প আরো উন্নত হলো। তেল আর সোনার মতো প্রাকৃতিক সম্পদ যারা সবার আগে হস্তগত করতে পারল, নিজেদের মর্জিমতো দুনিয়ার ছড়ি ঘোরাতে লাগল তারা।

আমরা এখন আছি তথ্যযুগে। জ্ঞান এখন আর কোনো আলাদা শক্তি নয়। গুগলের বদৌলতে সব তথ্য এখন আমাদের আঙুলের ডগায়। এখন যাদের বিচারবুদ্ধি আছে, সমাজের লাগাম তাদের হাতে। জ্ঞানের সঠিক ব্যবহার তারা করতে জানে। তথ্য বা জ্ঞান এখন সবার হাতে। কিন্তু সেটার ঠিক ব্যবহার কজন জানে? এক্স-রে প্লেইটে ভাঙা হাড় তো সবাই দেখতে পায়। কিন্তু সেটা দেখে কী করতে হবে সেটা যে জানে, সমস্যার সমাধান তারই হাতে।

প্রযুক্তি এখন অনেক জোরে উড়ছে। বিশাল বিশাল বিনিয়োগ হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিগ ড্যাটা ফিল্ডে। আমার জোর বিশ্বাস সামনের সময় হবে বিচক্ষণ-যুগ। তখন যাদের নীতিনৈতিকতা যত ভালো হবে, সমাজের নাটাই থাকবে তাদের হাতে। যেসব ব্যবসায়ী নীতিবান হবে, তারা হাল ধরবে সমাজের। এর কিছু উদাহরণ এরই মধ্যে আছে আমাদের সামনে। উবার, এয়ারবিএনবি, টুইটার বা ইবের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে দিয়েছে সমাজের চলতি জুলুম আর আমলাতন্ত্র। হ্যাঁ, কখনো কখনো ওরাও অবশ্য নতুন জুলুম শুরু করেছে, তা সত্য। যেমন : ট্যাক্সি-চালকদেরকে শুরুতে মুক্তি দিয়েছে উবার। কিন্তু পরে আবার এরাই ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে। ওদিকে ফেইসবুকের দ্বিমুখী আচরণ তো এখন প্রকাশ্য। ওরা ইচ্ছেমতো কিছু কন্টেন্ট ডিলিট করে দেয়; কিছু আবার জোর করে রাখে।

যেদিকেই তাকান, দেখবেন অগ্রণী লোকজন জনবান্ধবতার কথা বলছেন। যেসব কোম্পানির গ্রাহকসেবা ভালো, কোম্পানির লাভের বদলে যারা ভোক্তার সুবিধার কথা ভাবেন, তারাই থাকে এগিয়ে। আর্থিক আর পরিচালন-পদ্ধতির এই সামান্য মানসিক পরিবর্তনকে ছোট করে দেখার জো নেই। নীতিনৈতিকার এসব চর্চাই এখন কোম্পানিগুলোকে এগিয়ে নেয় তরতর করে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এখান থেকে আমরা হয়তো দেখব এক নাটকীয় পালাবদল।

তবে একটা বিভাজন থাকবে।

ক্ষমতার লাগাম যাদের হাতে, তারা ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ করতে হয় লোকজনদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করবে নয়তো তাদের মুক্ত করবে। যারা লোকজনদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করবে শুরুতে তারা জিতে যাবে। তবে লোকজন একসময় মুক্তি চাইবে। তারা বুঝতে পারবে কী মায়ার মধ্যে তারা এতদিন পড়ে ছিল। তখন সুবিচার আর নৈতিকতার পথ বেয়ে তারা খুঁজে নেবে সত্য।

বহু কাল পেরিয়েছে। কত কালে কত রূপ পেরিয়ে আজ সমাজ এসেছে বর্তমান চেহারায়। আমরা যদি এই সমাজের কান্ডারি হতে চাই, শুধু জ্ঞান আর প্রজ্ঞার মাস্তুল হাতে কাজ হবে না। আমাদের তৈরি করতে হবে বিভিন্ন রূপরেখা। ব্যাবসায়িক রূপরেখা, আর্থিক রূপরেখা ও পরিচালনা রূপরেখা। আর সবকিছুতে রাখতে হবে নীতিনৈতিকতার কাঠামো।

এখন খেলা হবে মূল্যবোধের।

যার নৈতিকতা যত ভালো সে-ই তো জিতবে... দিনশেষে।

শেষকথা

দুনিয়ায় কার্যকরী ফল দেখতে, মুসলিম উদ্যোক্তারা আছেন অন্যতম ভালো অবস্থানে। একজন মুসলিমের মনমগজ, আচার-আচরণ ঠিক করে দেয় ইসলাম। স্রষ্টাকে খুশি করে সবচেয়ে দামি জিনিস—জান্নাত অর্জনের খাতায় নাম লিখিয়েছে সে। জীবনের বাস্তবতার একদিকে আছে আখিরাত; জান্নাত লাভ এখানে চূড়ান্ত জয়। অন্যদিকে আছে মায়াজালে ভরা ক্ষণকালের দুনিয়া—এই বাস্তবতার বোধ যে মুসলিমের মাঝে প্রকট, সফলতার জন্য সে প্রস্তুত। এই বোধ থাকলে মুসলিম উদ্যোক্তা তার জ্ঞান আর অর্জন কাজে লাগিয়ে উন্নত করে আশপাশের সমাজ।

আল্লাহ যে সম্পদশালী হওয়াকে হারাম করেননি, এজন্য মুসলিম ব্যবসায়ী আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। সম্পদের ব্যবহার নিয়ে আল্লাহর নির্দেশনা সে বোঝে, পালন করে। সে জানে, মহামহিম আল্লাহ বলেছেন—

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তার মাধ্যমে আখিরাতের (স্থায়ী সুখভোগের) আবাস অনুসন্ধান করো। আর দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি (অন্যের প্রতি) অনুগ্রহ করো, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালোবাসেন না। [সুরা কাসাস, আয়াত : ৭৭]

আল্লাহর ওপর ভরসা করে ব্যবসায়ী মুসলিম নিজেকে ৯টা থেকে ৫টার চাকরির শেকল থেকে মুক্ত করে। 'সালাতুল ইসতিখারা' (আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনার সালাত)-এর হাতিয়ার কাজে লাগিয়ে আল্লাহ তার জন্য যে সম্পদ নির্ধারণ করেছেন, হালাল করেছেন, সে সেগুলো হাসিলের নতুন নতুন পথ বের করে। নিজের জীবন, নিজের পরিজনদের জীবনমান উন্নয়নে সে খুলে দেয় হাজারো বাতায়ন। তার ইসলামি নৈতিকতা তার নিয়তকে পথ দেখায়। সে ভালোর পথে এগোয় কারণ, সে পড়ে তার প্রভু তাকে বলেছেন—

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴿١١٠﴾

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য যাদের বের করা হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দেবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে।[১]

ব্যবসায়ী জীবনের আজাদি তালাশে সে পায় শক্তি। আরো বেশি করা, বেশি কিছু হওয়া, বেশি কিছু দেওয়ার শক্তি। সে মাথায় রাখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই কথা—'দুর্বল মুমিনের তুলনায় শক্তিধর মুমিন আল্লাহর নিকট অধিক উত্তম, অধিক পছন্দনীয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত আছে। যাতে তোমার উপকার রয়েছে তা অর্জনে তুমি আগ্রহী হও এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করো। তুমি অক্ষম হয়ে পড়ো না। যদি তোমার কোনো বিপদ হয় তাহলে এটা বলো না যে, 'যদি আমি কাজটি করতাম তাহলে এমন এমন হতো।' বরং এভাবে বলো যে, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, তিনি যা চেয়েছেন তা-ই করেছেন। কারণ 'যদি' শব্দটি শয়তানের কর্মের দুয়ার খুলে দেয়।[২]

মুসলিম উদ্যোক্তা আশাবাদী থাকেন। তিনি বোঝেন আল্লাহ তাকে যে নিয়ামত দিয়েছেন তা বেগার নষ্টের জিনিস নয়। এগুলো বিনিয়োগ করতে হবে আখিরাতের

---

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ১১০

[২] *সহিহ মুসলিম* : ২৬৬৪; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৭৯, ৪১৬৮; *মুসনাদু আহমাদ* : ৮৭৯১, ৮৮২৯; *আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি : ২০১৭৩; *আস-সুনানুল কুবরা*, নাসায়ি : ১০৩৮২, ১০৩৮৪, ১০৩৮৬; *শারহু মুশকিলিল আসার*, তাহাবি : ২৫৯, ২৬০, ২৬২; *শুআবুল ঈমান* : ১৯১; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৫৭২১, ৫৭২২; *মুসনাদু আবি ইয়ালা* : ৬২৫১, ৬৩৪৬; *মুসনাদুল বাযযার* : ৮৮৩৫

জন্য, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত কাজে লাগিয়ে যারা মঙ্গল করেন, আল্লাহ আমাদের তাদের মতো বানান। আল্লাহ আমাদের নিয়ত বিশুদ্ধ করুন। আমাদের করুন উম্মাহর কল্যাণে অগ্রণী।

আল্লাহ, আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দিন, আমাদের আখিরাতে কল্যাণ দিন। আমাদেরকে রক্ষা করুন জাহান্নামের শাস্তি থেকে।

আমিন।

ইরাদা আবদুল-হাদি

খুরাম মালিক একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যাবসায়িক কৌশলবিদ, লেখক এবং উঁচু মাপের পরামর্শদাতা। বিভিন্ন বিজনেস-ম্যাগাজিনে তাকে নিয়ে প্রায়ই আর্টিকেল বের হয়। বহু সুপরিচিত উদ্যোক্তা আর নেতৃস্থানীয় ব্যবসায়ীর উপদেষ্টা তিনি। হাজারো মানুষকে বিনিয়োগের মাধ্যমে মিলিয়ন-মিলিয়ন ডলার উপার্জনের পথ দেখিয়েছেন।

তার তৈরি করা ব্র্যান্ডিং ও বিপণন কৌশল Apple বা Uber-এর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। শত শত কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকবৃন্দ নিজেদেরকে আরো বিকশিত করার লক্ষ্যে তার কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

খুরাম মালিক সবাইকে উদ্যোক্তা হতে অনুপ্রাণিত করেন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী। বর্তমানে সপরিবারে বাস করছেন লন্ডনে। তিনি Stratagem.io সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা।

তার চেয়ে বোকা মানুষ এ পৃথিবীতে আর কে হতে পারে, যার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কখনো সফল হতে চায় না? ইসলাম আমাদের সফল হতে, সম্পদশালী হতে উৎসাহিত করে; ঋণের বোঝায় পিষ্ট নয়, বরং দাতা হয়ে বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে বলে। নবিজির সুন্নাহ অনুসরণ করে পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহকদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিয়ে বিত্তশালী হয়ে উঠছে।

ওদিকে মুসলিমরা কুরআন-হাদিস থেকে দূরে সরে দারিদ্র্যের নিগড়ে বন্দি হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। হালাল পন্থায় অঢেল সম্পদ গড়ে তোলার উপায়, আলোকিত সমাজ ও উন্নত রাষ্ট্র বিনির্মাণে ব্যবসায়ীদের ভূমিকা, দাসত্ব মনোভাব দূর করে উদ্যোক্তা হওয়ার কৌশল, কেন আমরা সফল হতে পারি না, কেন আমাদের কাজে বারাকাহ আসে না—ইত্যাদি হাজারো দিকনির্দেশনায় গড়ে উঠেছে চমৎকার একটি বই 'বিলিয়ন ডলার মুসলিম'।

বিক্রয়কেন্দ্র :
১১/১, ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৬১৬-৬২৬-৬৩৬